বাঙ্গলার রূপ

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী

দি বুক কোম্পানী
৪।৪এ কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা
আষাঢ়, ১৩২৯ সাল

মূল্য দেড় টাকা।

উৎসর্গ পত্র

প্রিয় সুহৃদ্

অধ্যাপক—শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু চক্রবর্ত্তী, এম, এ,

মহাশয়ের করকমলে

প্রকাশকের নিবেদন

'সাহিত্যে—বাঙ্গলার রূপ' ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রবন্ধগুলিই ইতিপূর্ব্বে 'নারায়ণে' প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, গ্রন্থকার কর্তৃক স্থানে স্থানে আবশ্যকমত পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

বিষয় সূচী ঃ—

প্রথম স্তবক ঃ—

দ্বিতীয় স্তবক ঃ—

তৃতীয় স্তবক ঃ—

---

* ১২০ পৃষ্ঠার ২২ লাইনে "কেবল সপিণ্ডা না হয়" স্থলে "কেবল সভর্ত্তিকা ও সপিণ্ডা না হয়" হইবে।

প্রথম স্তবক

বাঙ্গলার রূপ

নমো নমো বঙ্গভূমি ;—কানন-কুন্তলা, নদীমেখলা, শস্যাঞ্চলা তুমি। তুষার ধবল গিরিশৃঙ্গে তুমি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছ। মহাসমুদ্র তোমার চরণতল ধৌত করিয়া দিতেছে। অসংখ্য নরকঙ্কালকে বুকে লইয়া তুমি আজ কি স্বপ্ন দেখিতেছ ?

দিক্ দিগন্ত হইতে নানা স্রোত তোমার বুকে আসিয়া পড়িতেছে। আঘাতের পর আঘাতে যেন তুমি এক একবার চক্ষু মেলিতেছ, আবার তন্দ্রালসে চক্ষের পাতা মুদিয়া আসিতেছে।

সূর্য্যে তুমি দীপ্তি পাও, চন্দ্রে তুমি হাস, অন্ধকারে তুমি মুখ লুকাও। সৃষ্টি স্রোতের মত চলিয়াছে। এই স্রোতাবর্ত্তে তুমি কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছ ? বিশ্বের এই অনন্ত রূপে, এই অনন্ত মূর্ত্তি-স্রোতে, কি তোমার বিশেষ রূপ, কি তোমার বিশিষ্ট মূর্ত্তি ? আমরা তোমার সেই রূপ দেখিতে চাই। সেই রূপে আমাদের প্রাণ মন ডুবাইতে চাই। তোমার সেই অপরূপ রূপের বালাই লইয়া আমরা মরিতে চাই। আমরা যে তোমার সন্তান।

বাঙ্গলার একটা রূপ ছিল। সে রূপ কোথায় লুকাইল ? চক্ষু মুদিলে অন্ধকার দেখি। নিরাকার আর সমস্ত একাকার। কেন এমন হইল ? বাঙ্গালীর এ সর্ব্বনাশ কে করিল ? বাঙ্গালীর ধ্যানে বাঙ্গলার রূপ জাগে না কেন ?

বাঙ্গালীর মনে বাঙ্গলার মূর্ত্তি ফুটে না কেন? কিসে এমন হইল?

প্রাণের পরতে পরতে তোমার যে মূর্ত্তি খোদা ছিল, সে মূর্ত্তি ঢাকা পড়িল কিসের আবরণে? এই কুহেলিকা কোথা হইতে আসিল? এই কুজ্ঝাটিকা কে সৃষ্টি করিল? তুমি কোথায় ডুবিলে? কোন্ পাপের এ শাস্তি? প্রস্তর-স্তম্ভে, গিরিগাত্রে তোমার পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছ, আর বাঙ্গালীর অন্তর কি পাষাণ হইতেও পাষাণ? কোন্ পথে গেলে তোমার দেখা পাইব? তোমাকে না পাইলে আমরা কি লইয়া বাঁচিব? তোমাকে না পাইলে বাঁচিয়া লাভ কি?

এ যে বাঁচা মরার সন্ধিক্ষণ। এ ত লুকাইয়া থাকিবার সময় নয়। জাগ মা চৈতন্যময়ী, তুমি জাগ। বাঙ্গালীকে জাগাও। দিকে দিকে তোমার রূপ ছড়াইয়া দাও। আমরা বহুদিন পরে আর একবার সেই রূপ নয়ন মন ভরিয়া দেখি। আমাদের মানব জন্ম সফল হউক।

বর্ণরূপা তুমি। বর্ণে বর্ণে তোমার রূপ ফুটাইয়া তুল। বিচিত্র, অনন্ত রূপে তুমি আপনাকে প্রকট কর। বিশ্বের এই দুর্ব্বার স্রোতে তুমি আর একবার তোমার রূপের তরঙ্গ তুলিয়া দেখাও।

সর্ব্বাঙ্গে এ কি শ্মশান চুল্লী প্রজ্বলিত করিয়া বসিয়া আছ? দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ঝড়, ঝঞ্ঝাবাত—একি মূর্ত্তি? কেন এ মূর্ত্তি? অমাবস্যার ঘনান্ধকারে মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ হুঙ্কারে এই ঘন ঘোর দুর্য্যোগে দুর্ভাগা বাঙ্গালীর অদৃষ্ট লইয়া এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস?

বাঙ্গলার রূপ

শিবে, সর্ব্বার্থসাধিকে, মা মঙ্গলময়ী, বাঙ্গালী এত কি অপরাধ করিয়াছে, মা ?

এই কি তোমার রূপ ? অন্ধকারকে ঘিরিয়া অন্ধকার, ব্যোম্ —মহাব্যোমে তোমার তাণ্ডব নর্ত্তন, অণু পরমাণুতে প্রতি পলে তোমার উদ্দাম পদবিক্ষেপ, চক্র হ'তে চক্রান্তরে তোমার অশ্রান্ত ভ্রমণ।

কঙ্কালের উপর কেন এ খড়্গাঘাত ? ভীমা প্রলয়ঙ্করী, কঙ্কালবাসিনী, এমনি করিয়াই কি একটা জাতির অদৃষ্টকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবি, মা ?

নমস্তস্যৈ নমো নমোঃ ; সংবরণ কর, এ রূপ সংবরণ কর। বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রহরে বাঙ্গালী তোমার আর এক রূপ ধ্যান করিতে চায়।

কি সে রূপ ? একদিন বাঙ্গলার সেই রূপ বাঙ্গালীরই ধ্যানে মূর্ত্তি পাইয়াছিল। আজ বাঙ্গালী তাহা ভুলিয়াছে। তুমি বাঙ্গালীকে আজ সেই রূপ দেখাও। 'জ্বলচ্চিতা মধ্যগতাং'— সমগ্র দেশব্যাপি এই জ্বলন্ত চিতার মধ্যে দাঁড়াইয়া—'ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনী' মা,—তোমার মহা ভয়ঙ্করা লোলজিহ্বাকে সংযত কর। তুমি আয়ুঃ দাও, যশ দাও, সৌভাগ্য দাও, পুত্র দাও, ধন দাও, বাঙ্গলার সকল দুঃখ দূর কর, বাঙ্গালীর সকল অভীষ্ট পূর্ণ কর। মুক্তকেশী,—এই অন্ধকারে তোমার দক্ষিণ অঙ্গ ব্যাপিয়া আলুলায়িত কেশরাশি লম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গলার ভাগ্যে এ অন্ধকার কে ঢালিয়া দিয়াছে ? সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া এক মহাপ্রলয় দুলিয়া উঠিয়াছে। উদ্বেলিত প্রলয় পয়োধি হইতে বাঙ্গলাকে রক্ষা

কর। সহস্র সূর্য্যের দীপ্তি লইয়া তুমি বাঙ্গলার আকাশে উদিত হও। আমরা অন্নহীন, বস্ত্রহীন,—"বিচিত্র বসনে দেবি অন্নদান রতেহ নঘে"—হে বিচিত্র বসন পরিধানে, অন্নদানে নিরতে, তুমি ভবদুঃখ বিনাশিনী,—বাঙ্গালীর দুঃখ দূর কর। হে দেবী অন্নপূর্ণে, তুমি চন্দ্রকে শিরোভূষণ করিয়াছ, হে সর্ব্বানন্দ বিধায়িনী, হে সর্ব্ব সাম্রাজ্যদায়িনি,—বাঙ্গালীকে একটা সাম্রাজ্য দাও।

ছিল একদিন,—বাঙ্গালী এমন একটা সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছে, যাহা কোন দেশের কোন সাম্রাজ্যের চেয়ে হীন নয়। অথচ,—অন্যে দূরের কথা বাঙ্গালী-প্রধানদের মধ্যেই বা কয়জন তা জানে। বাঙ্গলার সৌভাগ্যসূর্য্য যেদিন মধ্যগগনে,—সেদিন বাঙ্গালী যে ভাষায় কথা বলিত,—ষড়্‌দর্শন খণ্ডন করিত,—নব নব ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিত,—সে ভাষা আমরা জানি না। সে বিরাট বাঙ্গলা সাহিত্যের একখানি ছিন্ন পত্র আজ নিতান্ত অপরিচিতের মত আমাদের সম্মুখে বাতাসে উড়িয়া আসিয়াছে, আমাদের বুদ্ধিমানেরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না,—এ সাহিত্য কার?

সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে জাতির সাম্রাজ্য ছিল, সাহিত্য ছিল, স্বাধীনতা ছিল, তার ছিল না কি? তার শিল্প ছিল, কৃষি ছিল, বাণিজ্য ছিল, অর্ণবপোত ছিল। তার অস্ত্র ছিল—সৈন্য ছিল—যুদ্ধ ছিল, দিগ্বিজয় ছিল। তার সিংহাসন ছিল, তপোবন ছিল,—মন্দির ছিল, মঠ ছিল, নগর ছিল, গ্রাম ছিল। তার জাতি ছিল—গণ ছিল, শ্রেণী ছিল, সংঘ ছিল। তার আচার ছিল—ব্যবহার ছিল—প্রায়শ্চিত্ত ছিল। তার নিশান ছিল, ডঙ্কা

ছিল, হুঙ্কার ছিল। একটা শক্তিমান মহান জাতি এই দেশে সহস্রবৎসরব্যাপি কি বিরাট ইতিহাস পশ্চাতে রাখিয়া আজ এক মুষ্টি অন্নের জন্য 'নিজ বাস ভূমে পর বাসী হয়ে' বাঙ্গলার সুদূর পল্লীর পথে ঘাটে মাঠে আধমরার মত পড়িয়া ধুঁকিতেছে। কোন্ পাপের এই পরিণাম? কত বড় পাপ করিলে পৃথিবীর এক অতি গৌরবশালী জাতিকে এই অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িতে হয়? সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সাম্রাজ্য ছিল, স্বাধীনতা ছিল যে জাতির, আমরা কি সেই জাতি? এই বিশ্বের বিচিত্র স্রোতধারার মধ্যে বাঙ্গালীর সভ্যতার কি একটা বিশেষ রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল? যুগে যুগে সেই রূপের কি বিভিন্ন রূপান্তর দেখা দিয়াছিল? সেই বিশিষ্ট রূপকে আশ্রয় করিয়াই বাঙ্গলার হিন্দু, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, একের পর আর ধর্ম্মকে গড়িয়াছে—ভাঙ্গিয়াছে—আবার গড়িয়াছে। সেই বিশিষ্ট রূপকে আশ্রয় করিয়াই বাঙ্গালী স্মৃতির আদেশ দিয়াছে,—নব্য দর্শনের উদ্ভাবন করিয়াছে,—গার্হস্থ্য, সমাজ ও সন্ন্যাসকে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করিয়াছে;—রাজদণ্ডকে নিয়মিত করিয়াছে, প্রজা শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়াছে, 'মাৎস্য ন্যায়' দূরীভূত করিয়াছে, সমগ্র ভূভারতে বাঙ্গলার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, আর এক অতি অপূর্ব্ব সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা কি সেই জাতি? আমরা সেই জাতি। তবে বাঙ্গলার রূপ আবার আমাদের চক্ষের সম্মুখে কে তুলিয়া ধরিবে? কোথায় সে জ্ঞানী গুণী, কোথায় সে চিত্রকর ভাস্কর, কোথায় সে শিল্পী, কবি, কোথায় সে বাঙ্গলার রূপের জীবন্ত বিগ্রহ?

সত্যই যিনি বলিয়াছেন বাঙ্গালীর মত একটা "আত্মবিস্মৃত জাতি" পৃথিবীতে আর দুইটি নাই, তিনি একেবারেই মিথ্যা কথা বলেন নাই।

পৌষ, ১৩২৬ সাল।

বাঙ্গালী, জাগ

প্রহরে প্রহরে পেচক ডাকিয়া গিয়াছে। নিশি ভোর হইতে চলিল। তুমি জাগ।

এত ঘুম তুমি কবে ঘুমাইয়াছ। এমন অলস স্বপ্নে কবে গা ঢালিয়া দিয়াছ। ঘুমের ঘোরে এমন প্রলাপ কবে বকিয়াছ। উঠ,—জাগ,—যাহারা ঘুমায়, তাহাদের জাগাও।

প্রান্তরে চিতাশয্যা রচনা করিয়া একদিন গভীর, তমাসচ্ছন্ন, স্তব্ধ নিশীথে যে প্রলয়-বহ্নিকে প্রাণপণ ফুৎকারে জ্বালাইয়া তুলিয়াছিলে, আজ প্রতি-প্রান্তরে তাহার লোলজিহ্বা তোমার অস্থি, মেদ, মজ্জা,—সর্ব্বস্ব আহুতি চায়। তবু কি আরও ঘুমাইবে? সেদিনও তুমি বলিয়াছিলে—

"ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই?
যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥"

তাইত বলি, ঘুমেরে ঘুম পাড়াও। বুঝি প্রভাত আসিতেছে। পূর্ব্বাস্য হইয়া আঙ্গিনায় দাঁড়াও। ঘোর কাটিয়া যাইতেছে। সমস্ত আকাশ ভরিয়া কাহার পায়ের শব্দ শুনা যায়। বুঝিবা আসিবে,—আসিয়াছে,—তুমি জাগ।

তোমার ছিল না কি? তোমার সবই ত ছিল। তোমার গৌড়-তাম্রলিপ্ত-সপ্তগ্রামাদি-নগর,—তোমার বিক্রমপুর, নবদ্বীপ,—

তোমার অতীত সাম্রাজ্যের কত উত্থান ও পতন,—প্রস্তর-গাত্রে তোমার ঘোষণা,—দিকে দিকে বিজয়-স্তম্ভে তোমার অনুশাসন, জনসংঘের বিপুল স্রোতের উপর দিয়া তোমার বিশাল কুলপ্লাবী ধর্ম্মপ্রবাহ,—দেবদেবী-মূর্ত্তি-স্রোতে তোমার শিল্প ও ভাস্কর্য্য,—বিচিত্র দেবমন্দিরে যুগ-যুগান্তরের পূজা ও আরতি,—এ কীর্ত্তি, এ ইতিহাস,—এ গৌরব তোমার। মৃতের চিতাশয্যা পরিত্যাগ করিয়া আর একবার জীবিতদের মধ্যে ফিরিয়া আইস। যাহার এত বড় অতীত ছিল, তাহার কোন ভবিষ্যৎ নাই,—ইহাও কি সম্ভব? তুমি জাগ।

একবার তুমি সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া এ তিমিরময়ী রজনীর পরপারে তাকাও। চিরদিন এমনই ছিল না। এই যে—

"পর দীপ-শিখা নগরে নগরে,—
তুমি যে তিমিরে—তুমি সে তিমিরে।"—

এ তোমার ছায়া,—এ তোমার কায়া নয়। এ মায়া, এ মোহ,—এ মিথ্যা। দু'দণ্ডের দুঃস্বপ্নে "আত্মবিস্মৃত জাতি,—" একবার চক্ষু মেলিয়া চাও;—দেখিবে, মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত তপন তোমার প্রভায় মলিন হইয়া যাইবে,—সমুদ্র বিপুল উচ্ছ্বাসে তোমার জয়গান করিয়া উঠিবে, উত্তরাপথে—হিমাদ্রিশিখরে জ্বলজ্জটামণ্ডিত ভালে তোমার উজ্জ্বল কিরীট জগৎ উদ্ভাসিত করিবে।

তোমার ইতিহাস কে জানে,—কে বলে? যদি জানিত,—যদি বলিতে পারিত যে, বাঙ্গালী একদিন শুধু বাঙ্গলার চতুঃসীমাতেই আবদ্ধ ছিল না,—এমন কি, ভারতের সীমান্ত-রেখাতেও তাহার পদচিহ্নের পরিসমাপ্তি হয় নাই;—বাঙ্গালী

ভারতের বাহিরে পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছে,—উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গের উপর দিয়া, যুদ্ধ ও বাণিজ্য-পোত,—অবলীলা-ক্রমে পরিচালনা করিয়াছে,—তাহা হইলে চক্ষুষ্মান্ জাতিসকল দেখিত যে, এই বাঙ্গালীই একদিন জগজ্জয়ী, জগদ্বরেণ্য ছিল। সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে! অন্ধকারে অন্ধ-যাত্রীসব আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়াছে। আলেয়া ত সূর্য্য নয়। বাঙ্গালার প্রভাত আরও কতদূরে?—

কিন্তু ইতিহাস মরে না। বাঙ্গলার ইতিহাস মরে নাই,—মরিবে না। বাঙ্গালী জাগিলেই,—বাঙ্গলার ইতিহাসও জাগিবে। এই যে মাটী,—কত যুগ ধরিয়া,—কতদুঃখ নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছে,—দেখিবে, সহসা এক বিরাট ভূমিকম্পে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সহস্রশির লইয়া জাগিয়া উঠিবে। বাঙ্গালার ইতিহাসের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ উপাদান—বাঙ্গালার জন-সাধারণ। বাঙ্গালী সমাজের উপর্য্যুপরি স্তরবিপর্য্যয়ে,—যে অখ্যাত অজ্ঞাত অগণিত জাতিসকল গর্ত্তে মুখ লুকাইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে,—সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া যাহাদের কেহ কোন দিন খুঁজিল না,—যাহারা তাহাদের কোন কথাই বলে নাই, সহসা তাহারা একদিন গর্ত্ত হইতে মুখ উঠাইয়া সহস্রা ফণা বিস্তার করিবে। অতীত ইতিহাসের যাহা উপাদান ছিল,—ভবিষ্যৎ ইতিহাসের উপাদনও তাহাই হইবে। "বিষহরি দেবী" বাঙ্গলায় আবার একবার ফণা বিস্তার করিবে। বাঙ্গলার মহা-কবিকে এ যুগে আর একবার নূতন করিয়া "মনসা-মঙ্গল" রচনা করিতে হইবে। বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ, বাঙ্গলার পাঠান-মোগল, বাঙ্গলার :সমুদ্র-পরপারের রাজশক্তি,—বাঙ্গলার জন-সাধারণের এই বিরাট অভ্যুদয়ে জগতে এক অতুল কীর্ত্তি ঘোষণা করিতে

পারিবে। বৌদ্ধ, জৈন, সৌর, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রবল বন্যা একের পর অপর যে মাটীর উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সে মাটী, চিরকাল বোবা হইয়া থাকিবে না। সে মাটী একদিন কথা কহিবেই কহিবে।

বাঙ্গলার অতীত গৌরবের অস্ফুট ধ্বনি আজ বাঙ্গলার পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—প্রত্যেক কেন্দ্রের কত অন্ধকার গুহা হইতে গুমরিয়া উঠিতেছে। এতকাল পরে ধীরে ধীরে এ কিসের জাগরণ,—এ কিসের অভ্যুদয়? যাহারা তাম্রশাসন ও শিলা-লিপির সন তারিখ মিলাইয়া, মৃত সতীর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে জুড়িয়া দিয়া, আবার তাহার মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্য পূজার আসনে ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়াছেন, এ বোধন-যজ্ঞের—তাঁহারাই পুরোহিত তাঁহারা সমস্ত বাঙ্গালী জাতির নমস্য! আমরা তাঁহাদের উদ্দেশে করযোড়ে বলি,—হে যাজ্ঞিক! অগ্নি প্রজ্বলিত কর, মন্ত্র উচ্চারণ কর,—আমরা মন্দিরের নিম্নতম সোপানে গললগ্নীকৃতবাসে দাঁড়াইয়া তোমাদের অপেক্ষা করিতেছি। মাকে দেখাও।

কবে কোন্ রন্ধ্রে, শনি প্রবেশ করিয়াছিল, সেই হইতে বাঙ্গালী গৃহস্থের প্রতি-ঘরে-ঘরে যে শালগ্রাম-শিলা বিরাজ করিত,—তাহা সিংহাসন হইতে কোন্ অভিমানে গড়াইয়া পড়িয়াছে যে, আজিও সেই "নারায়ণ" আর সিংহাসনে ফিরিয়া আসিয়া বসিল না। আমরা বাঙ্গালার এই শিলারূপী নারায়ণের জন্য দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরিয়া—বিদেশী ধর্ম্মযাজকের নিকট লজ্জা পাইয়াছি। নারায়ণকে লজ্জা দিয়া, যে লজ্জা কিনিয়াছি—আজ সে লজ্জা লুকাইয়া রাখিতে পারি, জগতে এমন স্থান নাই। হে শিলা, হে বিগ্রহরূপী,—

হে নারায়ণ, প্রতি অণু-পরমাণুতে তুমি পূর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছ। বাঙ্গলাকে তুমি ত্যাগ করিও না। বাঙ্গালীর এই দুঃখ-কষ্টের গৃহস্থালীতে আবার তুমি ফিরিয়া আসিয়া তোমার পরিত্যক্ত আসন গ্রহণ কর। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাসে,—স্তর-বৈচিত্রে যে এক মহা অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হইতেছে,—তুমি তাহার উপর তোমার শান্তিবারি বর্ষণ কর। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে,—যেমন যুগে যুগে আসিয়াছ,—তেমনই করিয়া আবার এস। আবার তুমি ইতিহাস-পথে আমাদের লইয়া ভ্রমণ কর। এই সুপ্তোত্থিত জাতির চিত্তে পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত করিয়া দেও। কেন না, আজ আমাদের স্মৃতিতে তুমি না ফিরিয়া আসিলে,—ভবিষ্যতের পথ একেবারে তমসাচ্ছন্ন।

তুমি দেখাও, এই বিস্তৃত বাঙ্গলার কোন্ কেন্দ্রে দাঁড়াইয়া একদিন সমবেত প্রজাশক্তি দেশব্যাপী "মাৎস্য-ন্যায়"কে বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে "প্রথম গোপাল দেবকে" রাজপদে নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। বাঙ্গলার প্রজাশক্তির সেই সিংহ-প্রতিম মূর্ত্তিখানি, যে মাটীর উপর একদিন চরণ-চিহ্ন আঁকিয়া গিয়াছে,—সে মাটী আমাদিগকে দেখাও। বাঙ্গলার প্রজাশক্তি একদিন যে রাজ-বংশকে নির্ব্বাচিত করিয়া, যাঁহার দ্বারা এদেশে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিল,—যে রাজবংশ সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে এক অতি গৌরবশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল—হে নারায়ণ,—তুমি বাঙ্গালীকে বলিয়া দেও যে, সে রাজা ও রাজবংশ মগধ হইতে আসে নাই। তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন। বরেন্দ্রভূমিই তাঁহাদের 'জনক ভূমি' বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস-পথে, পরে পরে কত বিপ্লবের অভ্যুদয়

ও অবসান, কত প্রজা-বিদ্রোহ, কত রাজ-হত্যা, পাল ও কৈবর্ত্ত-রাজবংশের উপর্য্যুপরি অভ্যুদয় ও অধঃপতন অতিক্রম করিতে করিতে আমরা অবশেষে সেন-রাজাদের রাজত্বে আসিয়া উপনীত হই। তাহার পরে দেখি পাঠান, তাহার পর দেখি মোগল। মুসলমান-শাসনে বাঙ্গলা প্রায় তিন শতাব্দী কাল বাস করিয়াও একদিন ১৫শ শতাব্দীর প্রায় শেষ ভাগে নবদ্বীপে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাঠী হইতে যে চারিটি দিগ্বিজয়ী শক্তিকে জগতে প্রেরণ করিয়াছিল, সে শক্তি-চতুষ্টয়ের প্রস্ফুরণে ১৬শ, ১৭শ, ও ১৮শ শতাব্দীর বাঙ্গলাও ধ্বংসের মুখে কায়ক্লেশে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে,— সে ইতিহাসও আজ মাত্র একটি শতাব্দীর ব্যবধানে বাঙ্গালীর স্মৃতি হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এমনই করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর "অবসাদ হিমে ডুবিতে ডুবিতে" বাঙ্গালীর শিথিল মুষ্টি হইতে একে একে সকলই খসিয়া পড়িয়াছে। আজ বাঙ্গালীর মত নিঃস্ব জগতে আর কে? অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, কাঙ্গালের মত, এ দ্বারে সে দ্বারে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাই! আর ভাবিয়া উঠিতে পারি না যে, যে বাঙ্গালী একদিন একটা সাম্রাজ্য হেলায় শাসন করিয়াছে, সে বাঙ্গালীর আজ এ দশা হইল কেন? কে আমাদের সর্ব্বস্ব অপরহণ করিয়া লইল? বাঙ্গলার গৃহলক্ষ্মীদের লজ্জা নিবারণের জন্য যে আমরা আজ এক খণ্ড ছিন্ন বস্ত্রের জন্য পর-প্রত্যাশী হইয়া চাহিয়া আছি,—বাঙ্গলার পুরুষ-শক্তির এত বড় দুর্গতি কোন্ যুগের ইতিহাস হইতে কে দেখাইতে পারে?

বাঙ্গালী, তুমি জাগ। তোমার নারী বিবস্ত্রা। তোমার সন্তান বুভুক্ষিত।

*   *   *   *

বাঙ্গালী জাগিবে, বাঙ্গলা জাগিবে। বিশ্ব-স্রোতে, বিশ্বের বিচিত্র সৃষ্টিস্রোতে বাঙ্গলা আবার শতদলের মত আপন গরবে আপনি ফুটিবে, আপনি ভাসিবে। সৃষ্টির বৈচিত্র্যে বাঙ্গলা তাহার স্বাতন্ত্র্য আবার একবার ফুটাইয়া দেখাইবে। "স্বাদিতে নিজ মাধুরী"—বাঙ্গলা রসে রূপে ভরপুর হইয়া আবার দেখা দিবে। বাঙ্গলার এ অন্ধকার কাটিয়া আবার পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইবে।

আমরা কি জানিতাম যে, বাঙ্গলার এত সুখ,—বাঙ্গালীর এত দুঃখ। কে আমাদিগকে ইহা জানাইয়া দিল? প্রাণের প্রদীপ কেমনে যে জ্বলিয়া উঠিল, তাহা কিছুই জানি না। শুধু বুঝিতেছি, পাপ তাপ লইয়া এই সমগ্র জীবন তাঁরি চলিয়া যাইবার পথ। তিনি আসিবেন—তাই এই জীবন-পথের কাঁটা তুলিয়া রাখিতেছি। এই জীবন-পথে হাঁটিতে হাঁটিতে একদিন হয়ত বেলা-অবসানে তিনি আসিয়া দেখা দিবেন। সমস্ত জীবন সে দিন তাঁহার চরণভরে কাঁপিয়া উঠিবে। যেন এখনই তাহার আভাস পাইতেছি। রাজা নয়, বিজয়োদ্ধত রথে তিনি আসিবেন না। আমার ব্রজের রাখাল, কোমল সবুজ ঘাসের বনপথে, বনমাল-গলে, ব্রজবেণু হাতে খেলিতে খেলিতে আসিয়া পড়িবে। এই বাঙ্গলার পথে আর একবার তাঁহাকে আসিতেই হইবে। বাঙ্গলার মাটির উপর দিয়া তাইত আমাদের সমস্ত জীবন বিছাইয়া দিতেছি। আর বাঙ্গালীকে বলিতেছি,—বাঙ্গালী, জাগ।

মাঘ, ১৩২৬ সাল

বাঙ্গালীর আদর্শ

শীত কাটিয়া গেল। আম্রকুলের গন্ধে বাতাস ভরিয়া উঠিয়াছে। দুঃখের পসরা নামাইয়া, একবার কি নিঃশ্বাস ফেলিতে দিবে না!

শস্যশীর্ষে রৌদ্রাঞ্চলখানি কাঁপিয়া কাঁপিয়া কৃষকের মনে যুগপৎ ভয় ও মোহের সঞ্চার করিতেছে। দেশে আকাল, বিদেশী বণিক অগ্রিম দাদনে ক্ষেতের ধান কিনিয়া নিয়াছে,—যদি কিছু থাকে, উত্তমর্ণের সুদের কতকাংশ বা শোধ হইতে পারে। কৃষক-পত্নীর পেট সারিন্দার খোল হইয়াছে,—শতছিন্ন বসনে কোনরকমে দেহের লজ্জা নিবারণ কোথায়ও হইতেছে—কোথায়ও হইতেছে না। একপাল ছেলে মেয়ে উঠানে পড়িয়া ধুঁকিতেছে,—গায়ে খড়ি, মাথায় শোণের জটা, জঠরে ক্ষুধার জ্বালা। কেহ মাটীতে গড়াইতেছে, কেহ কাঁদিতেছে,—কেহ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া আছে। ইহারা কে? কেহ বা হিন্দু, কেহ বা মুসলমান,—উভয়েই বাঙ্গালী। ইহারা বাঙ্গালার কৃষক।

তা'র পর,—তুমি আমি কে—? বাঙ্গালার ভদ্রসন্তান। আমরা কি করি? কেহ লিখি, কেহ পড়াই—কেহ বক্তৃতা করি। আমাদের অবস্থা কিরূপ? বাড়ী ভাড়ার সংস্থান করিতে পারি না। নিত্য আবশ্যক খাদ্য দ্রব্যের প্রতিদিনই অনাটন। পুত্রের পড়ার ব্যবস্থা হয় না। কন্যা কেরোসিন তৈলে অগ্নিসংযোগ করিয়া আত্মহত্যা করে। আছি বেশ। যদি জিজ্ঞাসা কর—কেন এমন হইল?—উত্তরে বলিব, জানি না। যদি আরও

পীড়াপীড়ি কর, তবে বলিব—জানি কিন্তু বলিতে পারি না। এক একবার মনে হয়, বুঝি বাঙ্গালী এ যুগে তাহার আদর্শ হারাইয়াছে,—তাই বাঙ্গলার এ দশা। বাঙ্গালী আমরা কোন দিনই ত একসঙ্গে মরিয়া হই নাই। বাঙ্গলায় একদিন একটা বৌদ্ধ-বিপ্লব দেখা গিয়াছিল। সমস্তই ওলট পালট হইয়া গিয়াছিল। হইতে পারে, কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ এই প্লাবন হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য কায়ক্লেশে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলার সে দিনের ইতিহাসে তাহাই বড় কথা নয়। সেদিনের ইতিহাসের বড় কথা এই—যে, বাঙ্গলার ইতর ভদ্র সেদিন ধর্ম্ম ও বুদ্ধের নামে সংঘবদ্ধ হইয়াছিল। হিন্দুর বর্ণাশ্রমের যে সকল রন্ধ্র দিয়া শনি প্রবেশ করিয়াছিল,—সেই সমস্ত রন্ধ্র দিয়াই প্লাবন প্রবাহিত হইয়াছে—সেই বর্ণাশ্রম ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সমভূম করিয়া দিয়াছে। যদি কোথায়ও এক প্রান্তে একদল চতুর ব্রাহ্মণ সশঙ্কচিত্তে সেদিন আত্মরক্ষা করিয়া থাকে ত,—সে কথা ইতিহাসে ভাবিবার মত কোন কথাই নয়। বাঙ্গলার জনসাধারণ বৌদ্ধবিপ্লবে একসঙ্গে দলবদ্ধ হইয়াছিল। তাহার ফলে, কে জানে, বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম সাহিত্যের জন্ম হয় কি, না? কে জানে, স্ত্রীশূদ্রের আত্যন্তিক ভেদজনিত সমাজ-বিন্যাসে—এক অভিনব সাম্যবাদের প্রথম প্রচার হয় কি, না? কে জানে, ব্রাহ্মণের অপেক্ষা না করিয়া, কেবলমাত্র এক প্রজাসাধারণের নির্ব্বাচনের উপর রাজধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল কি, না। কে জানে, বাঙ্গলার ইতিহাসে সমবেত প্রজাশক্তির যে বিদ্রোহের মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে দিব্বোক, রুদোক ও ভীমের আকস্মিক অভ্যুদয়ে—

বৌদ্ধবাঙ্গালার সামাজিক সাম্যবাদ এক আশ্চর্য্য প্রেরণা যোগাইয়াছিল কি, না? ধীমান্ ও বীতপালের শিল্প ও ভাস্কর্য্য লইয়া পণ্ডিতসমাজে যে আলোচনা চলিতেছে, কে জানে যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রেরণাতেই বাঙ্গালার শুধু সাহিত্যের জন্ম নয়, শিল্পেরও এক অনিন্দ্যসুন্দর আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল কি, না—? ভাটার মুখে বৌদ্ধবিপ্লব স্থানে স্থানে যে সকল আবর্জ্জনার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, তাহা বাঙ্গালায় বৌদ্ধপ্লাবনের চিহ্ন, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাই একমাত্র চিহ্ন নয়। সমস্ত বৌদ্ধযুগ ভরিয়া বাঙ্গালী কেবল এই অধুনাতন ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করে নাই। আর সে যুগে বাঙ্গালার কেবল তথাককথিত হাড়ী বাগ্দীরাই বৌদ্ধ হইয়াছিল না।

বৌদ্ধযুগে বাঙ্গলার জনসাধারণের প্রথম জাগরণ; সাম্যবাদের প্রথম প্রচার; বর্ণাশ্রমী সমাজের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ; ব্রাহ্মণ্যশক্তির প্রথম পরাজয়। যাহারা বাঙ্গলায় এ বিপ্লব ঘটাইয়াছিল, তাহারাও কি বাঙ্গালী ছিল? যাহারা ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে স্ত্রীশূদ্রের মুক্তিকল্পনা করিতে পারিয়াছিল,—তাহারা কি বাঙ্গালী ছিল? যাহারা বেদকে অস্বীকার করিবার স্পর্দ্ধা করিয়াছিল,—বৌদ্ধমতের দিক হইতে হিন্দুর ষড়্দর্শন খণ্ডন করিতে গিয়াছিল,—তাহারা কি বাঙ্গালী ছিল—? সে বাঙ্গালী কে এবং কাহারা? তাহাদের ধারা কোথায় লুকাইয়া গেল? আজ তাহাদের খুঁজিয়া পাওয়া যায় না কেন?

সেদিন বাঙ্গালীর একটা আদর্শ ছিল। আজ বাঙ্গালীর কোন আদর্শ নাই। তাই কি আদর্শভ্রষ্ট বাঙ্গালী আজ দুমুঠো

ভাতের কাঙ্গাল হইয়া রাজদ্বারের পাষাণ-সোপানে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে বসিয়াছে ?

"সাহিত্যামোদী"—আমাদের আদর্শ দেখাইতে বলেন। আদর্শ যে বাঙ্গালীর নাই,—তাহা কেমন করিয়া দেখান যাইবে ? ক্বচিৎ কখনও প্রাণে যে ভাব আসে,—যে রসের সঞ্চার হয়, তাহা হইতে মূর্ত্তি গড়িয়া তুলি, এমন ক্ষমতা ত বিধাতা দেন নাই। এই দুর্ভাগ্য লইয়াই এ জন্ম কাটিয়া যাইবে। কিন্তু ইহা হইতেও কি বড় দুর্ভাগ্য বাঙ্গলার নাই ? সে দুর্ভাগ্য তার—যে শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়িয়া তুলে। যে সৃষ্টি স্বভাবের অনুকারী নয়, সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট নয়—বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, সে সৃষ্টির কোন প্রশংসা নাই। বাঙ্গলার প্রাণ ধর্ম্ম,—স্বভাব-ধর্ম্ম হইতে গত শত বৎসরে কোথায় কি সৃষ্টি হইয়াছে ? এত বড় একটা বিরাট জাতি আজ যে আসিয়া একেবারে মরণের মুখে দাঁড়াইয়াছে—ইহার কি কোন কারণ নাই ? যদি থাকে, তবে তাহা কি ? যদি তুমি কবি হও, তবে মরণের প্রাক্কালে জাতিকে সে কথা একবার খুলিয়া বল। বজ্র হইতে ধ্বনি কাড়িয়া লও, মরণোন্মুখ জাতির কর্ণে যদি পার একটা মাভৈঃ বাণী উচ্চারণ কর। বাঙ্গালীকে একটা আদর্শ দেখাও,—যে আদর্শকে অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালী এ যুগে আবার সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে।

এক-টানা পুরাণো আদর্শে কোন জাতিই চলে না। বাঙ্গালীও চলে নাই। যুগে যুগে তাহার আদর্শের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বৌদ্ধবিপ্লবে যখন ভাটা পড়িল, তখন সময় বুঝিয়া লুক্কায়িত ব্রাহ্মণ্যশক্তি আবার দেখা দিল। নূতন বিন্যাসে সমাজকে

আবার বিন্যস্ত করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বের বাঙ্গালী, আর বৌদ্ধযুগের পরের বাঙ্গালী, এক নয়। হিন্দুর পুনরুত্থান-যুগের ব্রাহ্মণকে বিস্তর সমস্যা ঘাঁটিয়া পথ কাটিয়া চলিতে হইল। পুনরুত্থান-যুগের ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধবিপ্লবের পর বাঙ্গালীকে আবার আর একটা আদর্শ দিল। এ যুগের ব্রাহ্মণ যাহা করিতে চাহিয়াছিল, তাহা করিয়া উঠিতে পারে নাই। বৌদ্ধবিপ্লবের পর বাঙ্গলা যে সমস্যা লইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মীমাংসীকরণ পৃথিবীর প্রাচীন ও নবীন কোন যুগের কোন দেশের সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিজীবী মনুষ্যদিগের পক্ষেও সহজ ছিল না। বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ নির্ব্বোধ নয়। বুদ্ধি যাহা করিতে পারে,—ব্রাহ্মণ তাহা করিবার সূত্রপাত করিয়াছিল। পুনরায় বর্ণাশ্রম-প্রতিষ্ঠা পুনরুত্থান-যুগের ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাঁহারাও শিব গড়িতে গিয়া যাহা গড়িয়াছিলেন—তাহা শিব নয়—অ-শিব। বর্ণাশ্রমের পুনঃপ্রতিষ্ঠায়—মধ্য দুই বর্ণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের আর পুনরুদ্ধার হইতে পারিল না। মুসলমান-আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বকালের বাঙ্গলায় দেখা গেল,—মাত্র দুইটি বর্ণ—ব্রাহ্মণ আর শূদ্র। আবার এই শূদ্রের মধ্যেও সহস্র প্রকারের ভেদ ও সম্প্রদায়। শূদ্রের কোন সম্প্রদায় বা ব্রাহ্মণের অনুগৃহীত,—আবার কোন সম্প্রদায় বা ব্রাহ্মণ্যশক্তির কবলে পড়িয়া নির্য্যাতিত! বৌদ্ধপ্লাবনে ব্রাহ্মণের দিক হইতে যাহারা পতিত—তাহাদিগের সকলকে মিলাইয়া গুছাইয়া, ঝাড়িয়া পুঁছিয়া পুনরায় বর্ণাশ্রমের শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে আনিয়া বিন্যস্ত করা কার্য্যটি ব্রাহ্মণের পক্ষেও বড় সহজ ছিল না। যাহারা

'বৌদ্ধসমাজে বাস করিয়া একবার সামাজিক সাম্যবাদের উদার ভূমিতে বিচরণ করিয়া আসিয়াছে,—তাহারা অতি সহজে ব্রাহ্মণের বর্ণাশ্রমে মস্তক অবনত করিতে পারিল না। যে ব্রাহ্মণেরা সে দিন বাঙ্গলায় এই উৎকট সমস্যার মীমাংসার ভার গ্রহণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ নব-উত্থিত হিন্দু-রাজশক্তির সহিত সন্ধি করিয়া, দেশময় বিলুপ্ত ক্ষাত্র ও বৈশ্য শক্তির পুনরুদ্ধারে ছুটিতে হইয়াছিল। বর্ণের সহিত আশ্রমের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সনাতন বর্ণাশ্রমে, বর্ণ ও আশ্রম অঙ্গাঙ্গী যোগে পরস্পর আবদ্ধ। বৌদ্ধযুগের পর সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়ার ভাব সমাজে দেখা দিয়াছিল—নানা উপধর্ম্মের আবরণে সেই প্রতিক্রিয়া নানা উশৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিতেছিল। বর্ণ ও আশ্রম-ত্যাগী—অনাচারী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে একদিনে এক কথায় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পরিত্যক্ত বর্ণ ও আশ্রমে আহ্বান করিতে পারেন নাই সত্য; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, নানারূপ স্খলন, পতন ও ত্রুটির মধ্য দিয়াও ব্রাহ্মণ সেই বৃহৎ যজ্ঞেরই ইন্ধন সংগ্রহ করিতেছিলেন। এবং আরও মনে রাখিতে হইবে যে, পতিত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের বহুতর শাখাপ্রশাখাও সে দিন ব্রাহ্মণের কথায় এক দিনেই স্ব স্ব বর্ণে ও আশ্রমে পুনঃপ্রবেশের জন্য উন্মুখ হইয়াছিল, তাহাও নহে। অনাচারী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সহিত শূদ্রের কোন পার্থক্য সে দিন ছিল না বলিয়াই ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে শূদ্রের পদবীতেই রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণকে পুনরুত্থান-যুগের

ব্রাহ্মণ একেবারেই অন্বেষণ করেন নাই, বা তাহাদের পুনরুদ্ধারের জন্য অগ্রসর হন নাই—এমন কি প্রমাণ ইতিহাস দিতে পারে? বরং এই কথাই বলা যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেন-রাজবংশের অধঃপতনের পর হইতে সমগ্র মুসলমান-শাসন কালেও—বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ, বাঙ্গলার ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বহু স্থানে এবং বহু পরিমাণে স্বীকার করিয়াছে। প্রমাণ—রঘুনন্দনেরই স্মৃতি। যে রঘুনন্দনের বিরুদ্ধে উদ্যত খড়্গের অভাব নাই—যে রঘুনন্দন কলিতে অনাচারী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে, শূদ্রই স্থির করিয়া গিয়াছেন,—সেই রঘুনন্দনই প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা কোন কোন বিশেষ অবস্থায় বাঙ্গলার ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে উদ্ধার করিয়া লইবার আদেশ দিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর ব্রাহ্মণ ও মুসলমানের বাঙ্গলায়, হিন্দুসমাজের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অস্তিত্ব নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিয়াছেন। বাঙ্গলার ব্রাহ্মণের বুদ্ধি ছিল, এ কথা ব্রাহ্মণদ্বেষীর মুখেই শুনা যায়। কিন্তু বাঙ্গলার ব্রাহ্মণের হৃদয় একেবারেই ছিল না, একথা কেবল তাঁহারাই বলেন—যাঁহারা বাঙ্গলার ইতিহাস সম্বন্ধে অল্পই আয়াস স্বীকার করেন। অথচ তাঁহাদের কল্পনা, দেখা যায় যে, অনেক সময়েই ইতিহাস নয়।

বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধবিপ্লবের পরে বাঙ্গালীকে একটা আদর্শ দিয়াছিল। কিন্তু হতভাগ্য ব্রাহ্মণ, আর তদপেক্ষা হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতি! ব্রাহ্মণ সমগ্র জাতিটাকে সেই আদর্শের অনুপাতে সাজাইয়া গুছাইয়া শ্রেণীবদ্ধ করিতেই ভারতের উত্তর-সীমান্তে তূর্য্যধ্বনি হইল, সমস্ত ভারতাকাশ কাঁপাইয়া তাহার প্রতিধ্বনি ছুটিল—ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতেই ইসলাম-

পতাকাবাহী আর এক মহিম্ন জাতি বাঙ্গলার সিংহাসনে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইল! অবশ্য একদিনে বাঙ্গলা মুসলমানকে তাহার সিংহাসন ছাড়িয়া দেয় নাই। পশ্চিম-বঙ্গের প্রাসাদ-তোরণে যখন ইসলামের অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছিল,—পূর্ব্ব-বঙ্গের প্রাসাদশীর্ষ হইতে তখনও স্বাধীনতা-সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু নিভিয়া যায় নাই। কিন্তু যাহাই হউক, ইসলামের বেগ বাঙ্গলা সহ্য করিতে পারে নাই। ইসলামের শাসনদণ্ডের নিকট হিন্দু ও বৌদ্ধ একসঙ্গে মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বাঙ্গলা যদি বিস্তীর্ণ ভারতের একটি প্রদেশ না হইয়া, একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র দেশ হইত—তবে উত্তরাপথের মুসলমানের অভিযানে হয়ত বাঙ্গালী হিন্দু ও বৌদ্ধ স্বাধীন থাকিতে পারিত। কিন্তু মগধের সীমা কোথায়—উৎকলের আরম্ভ কোথায়—বাঙ্গলা তাহার মধ্যে জড়িত মিশ্রিত হইয়া, ভারত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া কিরূপে একা আত্মরক্ষা করিবে? যেথানে একটা বিশাল সাম্রাজ্য ডুবিয়া গেল, সেথানে সেই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটা প্রদেশ কি করিয়া রক্ষা পাইবে? তথাপি বাঙ্গলা অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া মুসলমানের সঙ্গে বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছে—এক শতাব্দী পরে মুসলমানের অধীনে সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। বাঙ্গলায় মুসলমান-বিজয়, সপ্তদশ-অশ্বারোহী-মূলক আরব্য-উপন্যাসের এক রাত্রির কোন আশ্চর্য্য স্বপ্ন নয়।

বাঙ্গলা হিন্দু ও বৌদ্ধের ছিল; বাঙ্গলা মুসলমানের হইল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পুর্ব্বে বাঙ্গলায় ছিল—হিন্দু ও বৌদ্ধ; ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে

বাঙ্গলায় দেখা দিল—হিন্দু ও মুসলমান। আজ বাঙ্গলায় যে অৰ্দ্ধেক মুসলমান—ইহারা সকলেই কি পাঠান না মোগল? ইহারা তাহার কিছুই নহে। ইহারা বৌদ্ধ ও হিন্দু সমাজস্থ বাঙ্গালী। কেন বৌদ্ধগণ মুসলমান হইল, কেন হিন্দুগণ মুসলমান হইল—আবার পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রত্যূষেই কেন এবং কোথা হইতে রাজা গণেশের অভ্যুদয় হইল? কেনই বা রাজা গণেশের পুত্র যদু মুসলমান-ধৰ্ম্ম অবলম্বন করিয়া জালালুদ্দীন নাম গ্রহণ করিল?—এ সমস্ত তথ্য যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে তত পরিষ্কাররূপে বলা যাইতে পারে না, যাহাকে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইতিহাস বলিয়া অসঙ্কোচে স্বীকার করিতে পারেন। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে যে, পুনরুত্থান-যুগের ব্রাহ্মণগণ যে বৌদ্ধসমাজকে বর্ণাশ্রমে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ব্যবস্থা করিতেছিলেন—সেই বৌদ্ধসমাজ হইতেই ইসলামীয় রাজশক্তির প্রবল ইচ্ছায় ও অপ্রতিহত প্রভাবে দলে দলে বৌদ্ধগণ মুসলমান-ধৰ্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। ব্রাহ্মণের নূতন ব্যবস্থায় যে সমস্ত সম্প্রদায় হিন্দু-সমাজে যোগ্য বর্ণে ফিরিয়া আসিতে পারে নাই, এবং যে সমস্ত সম্প্রদায় নিতান্তই নিম্নজাতীয় ও বৌদ্ধ-ধৰ্ম্মের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে অনাচারী, তাহাদিগকে শূদ্রের পংক্তিতে রাখা ভিন্ন ব্রাহ্মণের আর কি উপায় ছিল? এই সমস্ত সম্প্রদায় যে সহজেই মুসলমান হইয়া যাইবে,—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি—? বাঙ্গালীই মুসলমান হইয়াছিল। মুসলমান কি আর নূতন করিয়া বাঙ্গালী হইবে?

পুনরুত্থানযুগের ব্রাহ্মণ তাঁহার আরব্ধ কার্য্য শেষ করিবার

পূর্ব্বেই বাঙ্গলায় মুসলমান আসিয়া সেই বৃহৎ যজ্ঞকে কোন কোন দিকে বাধা দিল, এবং কোন কোন দিকে সত্যই সহায়তা করিল। যদি একথা সত্য হয় যে, মুসলমানগণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৌদ্ধশ্রমণদের উপরেই অধিকতর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা হইলে একথা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, অনেক সদ্ধর্ম্মী ও সদাচারী বৌদ্ধসম্প্রদায় মুসলমান হইবার ভয়ে তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া হিন্দুর বর্ণাশ্রমের যে-কোন একটা বিভাগে আশ্রয় লইয়াছিল। বাঙ্গলায় মুসলমান-আগমনে এইরূপে বাঙ্গালী বৌদ্ধকে, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই ভাগ করিয়া লইল। এইরূপে বাঙ্গলায় বৌদ্ধচিহ্ন তাড়াতাড়ি লুপ্ত হইয়া গেল। মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম্মও অনেক বাঙ্গালী বৌদ্ধকে বৈষ্ণবধর্ম্মে আশ্রয় দিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের গ্রাস হইতে রক্ষা করিল। একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, বৈষ্ণবধর্ম্মে যত সামান্য পরিমাণেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষেধ থাকুক, মহাপ্রভু ব্রাহ্মণ ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্রাহ্মণের হৃদয় হইতেই প্রবাহিত হইয়াছে।

বাঙ্গলার ব্রাহ্মণকে গালি দিতে যাঁহারা শতমুখ, তাঁহারা আজিকার ব্রাহ্মণ দেখিয়া সেদিনকার ব্রাহ্মণকে বিচার করিবেন না। বাঙ্গলার ব্রাহ্মণের প্রতি যাহার মমত্ব বোধ নাই, সে বাঙ্গলার ইতিহাস জানে না—সে বাঙ্গলার গৌরব কি, তাহা বুঝে না। সমগ্র মুসলমান-যুগে যদি ব্রাহ্মণ না থাকিত, তবে আমরা আজ কেহই থাকিতাম না। বৌদ্ধবিপ্লবের পরে যদি ব্রাহ্মণ না দেখা দিত, তবে বাঙ্গলায় আজ একজন হিন্দুও পাওয়া যাইত না।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই কেন সমস্ত বাঙ্গালীকে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণে ডাকিয়া লইলেন না? এ প্রশ্ন কেহ উঠাইতে পারেন। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা যে স্ব স্ব আচার গ্রহণ করিয়া, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, গুণকর্ম্ম বিভাগ অনুসারে স্ব স্ব বর্ণে ফিরিয়া আসিবার জন্য ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে দ্বাদশ শতাব্দীতে আহ্বান করেন নাই—তাহার প্রমাণ কি? কোন কোন সম্প্রদায়কে জাতিচ্যুত করা হইয়াছিল। তাহা যে আবশ্যক হয় নাই—তাহা কে নিশ্চয় বলিতে পারে? ব্রাহ্মণ কি ব্রাহ্মণদের জাতিচ্যুত করেন নাই? ব্রাহ্মণেতর বহু সম্প্রদায় ও বহু জাতিকে কি তাঁহারা উদ্ধার করিয়া লয়েন নাই? কার্য্য গুরুতর ছিল, সময় সঙ্কীর্ণ ছিল। শূদ্র পদবীতে অবনত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সর্ব্বাংশেই বর্ণাশ্রমে শ্রেণীবদ্ধ হইবার অনুকূল ছিল কি না, তাহাই বা কে বলিবে? সমাজবিন্যাস ত ইটপাটকেলের ইমারত গাঁথা নয়। বিক্ষিপ্ত বহুতর আচারভ্রষ্ট সম্প্রদায়কে আবার বর্ণাশ্রমের আদর্শে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তুলা যে কতবড় কঠিন কাজ, তাহা কেবল তাঁহারাই জানিতেন, যাঁহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধযুগের পরে বাঙ্গালীকে একটা আদর্শ দিয়াছে। সমগ্র মুসলমানযুগ ধরিয়া একটা আদর্শকে বাঁচাইয়া রাখিবার প্রয়াস করিয়াছে। সমগ্র মুসলমান-যুগে এই ব্রাহ্মণই বাঁচিয়া ছিল। আর ব্রাহ্মণ বাঁচিয়াছিল বলিয়াই, আজ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের আবার জাগরণের সম্ভাবনা আছে। মুসলমান-যুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে ব্রাহ্মণ না হয় নাই স্বীকার করিয়াছিল, তাঁহারা নিজেরাও ত নিজদিগকে স্বীকার করেন নাই। সমগ্র

মুসলমানযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কোন অভ্যুদয় ত দেখিতে পাই না। ব্রাহ্মণের উপর রাগ করিয়া অথবা প্রাণভয়ে ভীত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করা কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম? ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য মুসলমানযুগে বর্ণত্যাগী ও আশ্রমত্যাগী হইয়া শূদ্রবৎ আচরণ করিয়া আসিয়াছে—কাজেই শূদ্রবৎ ব্যবহার পাইয়াছে। দেশরক্ষার ভার যাহার উপর ছিল, সে যদি দেশকে রক্ষা করিতে না পারিল, তবে ব্রাহ্মণ-সমাজে এমন অ-ব্রাহ্মণ কে আছে যে, তাহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিনন্দিত করিবে? পরাধীন দেশে কোন সম্প্রদায়ই ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতে পারে না। অবশ্য দেশ পরাধীন হইলে ব্রাহ্মণ্যশক্তিরও অধঃপতন অনিবার্য্য রূপেই ঘটিয়া পড়ে। কিন্তু দেশ যে পরাধীন হইল, সেজন্য দায়ী কে? ব্রাহ্মণ—না ক্ষত্রিয়?

দোষ কেবল একা এক ব্রাহ্মণেরই নয়। যাহা সকলের দোষ, তাহা কেবল এক ব্রাহ্মণের স্কন্ধে চাপাইলে চলিবে কেন? আজ যে বৈদ্য ও কায়স্থ সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ-সভার বিরুদ্ধে রোষকষায়িতলোচনে তীব্র দৃষ্টিপাত করেন ও কিঞ্চিৎ অধৈর্য্যের সহিত উষ্ণ-বাক্য প্রয়োগ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন না, তাঁহারা বিস্মৃত হন যে, জল-অনাচরণীয় বাঙ্গলার বিশাল জাতিসঙ্ঘসমূহ ব্রাহ্মণের নিকট স্পর্শজনিত যে অন্যায় ব্যবহার আর পাইতে ইচ্ছা করেন না, সেই অন্যায় ব্যবহার, ব্রাহ্মণ যাহাদের শূদ্র বলেন, সেই শূদ্র জাতিদের নিকট পাইতে আরও অধিকতর অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। আর ইহা কি খুব স্বাভাবিক নয়? সমস্যা কেবল ইহা নয় যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রকে অস্পৃশ্য জ্ঞান

করেন। সমস্যা ইহাই যে, যখন এক শূদ্র অন্য শূদ্রকে বলে, 'তুমি আমায় ছুঁইও না'। তখন শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণের অবজ্ঞা যদি দোষের হয়, তবে শূদ্রের প্রতি শূদ্রের ঘৃণা একেবারেই অসহনীয়।

সমগ্র মুসলমানযুগে ব্রাহ্মণকে পুরোভাগে রাখিয়াই, বাঙ্গলার বৌদ্ধ হিন্দু-সম্প্রদায়ে আত্মবিলোপ করিয়াছিল। বাঙ্গালী হিন্দু কায়ক্লেশে তাঁহার হিন্দুয়ানীর একটা ধারা বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। সেই প্রশস্ত ললাট—উন্নত নাসা,—তীব্র চক্ষু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, কাশী, মিথিলা ও দ্রাবিড় হইতে বাঙ্গলার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে,—বিলাসের তরঙ্গে আজিকার মতন আকণ্ঠ নিমজ্জমান হইতে ঘৃণা বোধ করিয়াছে। সেই অস্তোন্মুখ প্রতিভার শেষ রশ্মিটুকু বুনো রামনাথে পর্য্যন্ত দীপ্তি পাইয়াছে।

সত্যই মুসলমানযুগেও বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ ছিল। ব্রিটিশযুগে কিন্তু সেই গ্রীক বাহিনীর গতিরোধকারী তীক্ষ্ণমেধাসম্পন্ন চাণক্যের বংশধরগণ আর নাই,—থাকিলে বাঙ্গলায় দেখিতে দেখিতে উপজাতিসঙ্কট এমন একটা আসন্ন বিপ্লবের ছায়া ফেলিতে পারিত না—বাঙ্গলার ভদ্র ইতর সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্ন বস্ত্রের জন্য এমন হাহাকার উঠিত না—ব্রাহ্মণ্য-শক্তি বেহারী জমিদারকে ভাড়া করিয়া বাঙ্গলায়, ব্রাহ্মণসভারূপ প্রহসন করিতে সত্যই লজ্জা বোধ করিত। দীপ নিভিয়া গিয়াছে। এইবার বুঝি শশ্মানে মশাল জ্বলিয়া উঠে!

আজ যে বাঙ্গালী না খাইতে পাইয়া মরিতে বসিয়াছে—তাহার কারণ, পলাশীর যুদ্ধের পর হইতেই বাঙ্গালীর সম্মুখে

কোন আদর্শ কেহ তুলিয়া ধরিতে পারে নাই। আজ দেড় শত বৎসর সত্যই বাঙ্গালী তাহার স্বভাবধর্ম্মানুযায়ী আদর্শভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ! তুমি কি এই আদর্শকে আবার তুলিয়া ধরিতে পারিবে? সে শক্তি কি তোমার আছে? না, বৌদ্ধবিপ্লবের মত আর একটা সমাজবিপ্লবে সকলে সমভূম হইয়া যাইবে। কে জানে, ভবিষ্যতে বাঙ্গলা আবার কি আদর্শ প্রকট করিবে?

ফাল্গুন, ১৩২৬ সাল।

বাঙ্গলার কথা

এই বাঙ্গলা দেশ কাহার ছিল,—কাহার হইতে চলিল? বাঙ্গলার মাটী কি এক উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়াছে, যেখানে এত সহিয়াছে, সেখানে আর সহিতে পারে না। অসহ্য হইয়াছে। এ উত্তাপ কিসের? বাঙ্গলায় কি আবার ভূমিকম্প হইবে?

মহাশূন্যে ভ্রাম্যমাণ কোন গ্রহ বা উপগ্রহ যদি আজ সহসা কক্ষচ্যুত হইয়া—বাঙ্গলা দেশের উপর নিপতিত হয়,—বাঙ্গলা দেশ যদি আজ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলিমুষ্টির মত উড়িয়া যায়,—বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর অতীত ইতিহাসের সকল প্রকার কীর্ত্তিচিহ্ন যদি আজ বিলুপ্ত হয়,—তবে তাহাতে কাহার কি আসে যায়? বাঙ্গালী কবে কাহার কি করিয়াছে? বাঙ্গালীর জন্য কে কাঁদিবে, কে দুঃখ করিবে? কেনই বা করিবে? বাঙ্গালীর ইতিহাস কেহই জানে না,—বাঙ্গালীও জানে না। যাহার ইতিহাস অজ্ঞাত, তাহার ধ্বংসে মানব-সভ্যতার কি ক্ষতি?—বাঙ্গলার ইতিহাসের অতি সামান্য ভগ্নাংশমাত্রও আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইতিহাসের এই উপাদান অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে,—তাহা আর পাওয়া যাইবে না। যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহার উদ্ধার-সাধন সহজ কথা নয়। তাহা ব্যয়সাপেক্ষ, চেষ্টাসাপেক্ষ,—সাধনাসাপেক্ষ। যে জাতির মধ্যে তাহার ইতিহাস-উদ্ধারের জন্য চেষ্টার অভাব, অর্থের অভাব,—সে জাতির আশা কোথায়?

আমরা কি ছিলাম, তাহা জানিতে না পারিলে কি করিয়া

বুঝিব যে, আমরা কি হইতে চলিয়াছি? আমরা একটা কিছু ছিলাম মহৎ, বৃহৎ,—একটা কিছু হইতে চলিয়াছি—উদার বিশ্বব্যাপী;—যাহা কেবল প্রাচ্য নয়, কেবল পাশ্চাত্যও নয়—অথচ উভয়ের সংমিশ্রণে এমন একটা কিছু,—এই প্রকার অনিশ্চিত অসংবদ্ধ প্রলাপ, আর কতকাল আমাদের চিত্ত হরণ করিবে? আমরা আগে জানিতে চাই যে আমরা কি ছিলাম।

বাপ-পিতামহের নাম না জানিয়া আত্মপরিচয় দিতে উন্মুখ,—এমন কুলাঙ্গার মনুষ্যসমাজে কে আছে? পৃথিবীতে আজ আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার দিন সমাগত। আত্মপরিচয় সম্পর্কে লোকে বাপ পিতামহের নাম এখনও অনেকস্থানেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। যদি কাহার কাহার ইহাতে আপত্তি থাকে, থাকুক। তাহাদের কথায় কি আসে যায়? সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ইহাতে আপত্তি থাকিবার কোন কারণ নাই। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ,—অতীতের কোন সংমিশ্রণেই আমরা ভীত হই নাই, ভবিষ্যতেরও কোন সংমিশ্রণে আমরা ভীত হইব না। আজ আত্মপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীকে তাহার পূর্ব্ব পুরুষের পরিচয়টাও জানিতে হইবে। নতুবা পরিচয়ের কোন বিশিষ্টতা থাকিবে না,—প্রতিষ্ঠা পূর্ণতালাভ করিবে না। বাঙ্গালীর যদি মিসর, ব্যাবিলন বা চীনের মত একটা প্রাচীন সভ্যতাই থাকে, তবে তাহা,—কাল যাহাই করিয়া থাকি না কেন,—আজ আর ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না। বাঙ্গালীকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিতে হইলে,—স্বাধিকার-লাভে প্রমত্ত করিয়া তুলিতে হইলে,—তাহার স্বপ্রকৃতিকেই অনুসরণ করিতে হইবে। বাঙ্গালীর ইতিহাস-পথে

ভ্রমণ না করিলে তাহার স্ব-প্রকৃতির অনুসন্ধান কোথায় সম্ভব ও সার্থক হইবে? কোন জাতিই অন্য জাতির প্রকৃতিকে অনুসরণ করিয়া, অধঃপতন হইতে পুনরুত্থান করিতে পারে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী-চরিত্রই ইহার প্রমাণ। মেকলে সাহেব ইংলণ্ডের ইতিহাস লিখিয়া থাকিলেও বাঙ্গলার ইতিহাস তিনি জানিতেন না। বাঙ্গালী-জাতির চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া, তিনি যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন,—তাহাই এ যুগে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির নিকট বাঙ্গালীর একটা সাধারণ রকমের পরিচয়-পত্র-স্বরূপ। সম্ভবতঃ অদ্যাপি ইহা একেবারে অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছে না। আমাদের রাজার সগোত্র একজন অতি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ঐতিহাসিক কেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী-চরিত্র সমালোচনা করিতে যাইয়া এমন সব অকথা কুকথা বলিলেন, যাহা মনুষ্যমাত্রেরই অপমান-জনক? সাহেব কি ইচ্ছা করিয়া বাঙ্গালীকে শুধু অপমান করিবার জন্যই ঐরূপ লিখিয়া গিয়াছেন? এই প্রসঙ্গে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া, তাহার পর তাহাকে মরা বলিয়া গালি দিয়া লাভ কি? তবে কি বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করিতেন যে, ইংরেজের অধীনে বাস করিয়াই বাঙ্গালীচরিত্র এতদূর পর্য্যন্ত কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে। মোগল-শাসনকালে বাঙ্গালী কিরূপ ছিল? পাঠানশাসন-কালেই বা বাঙ্গালী কিরূপ ছিল? মোগলশাসন অপেক্ষা বাঙ্গলায় পাঠানশাসনের উপর বঙ্কিমচন্দ্র অধিকতর উদারমত পোষণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পাঠানশাসনে কি বাঙ্গালী চরিত্র উন্নতিলাভ করিতেছিল? পাঠানশাসনে বাঙ্গালীর বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র ও বাহুবলের নিদর্শন

কোথায় ? রঘুনন্দনের স্মৃতি, রঘুনাথের নব্যন্যায়, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রশাস্ত্রোদ্ধার এবং সর্ব্বাপেক্ষা মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও তদঙ্গীয় বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য,—ইহাই কি পাঠানযুগের বাঙ্গালীর বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্রবলের নিদর্শন ? বাঙ্গালী জমীদারের স্বাতন্ত্র্য ও শাসন যতটা পাঠানযুগে অব্যাহত ছিল, তাহাই কি বাঙ্গালীর তৎকালীন বাহুবলের পরিচয় ? বাঙ্গলার যে সমস্ত উৎকৃষ্ট শিল্পজাত দ্রব্য পাঠানযুগেও বাঙ্গলার বহির্বাণিজ্যকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে;—সুসভ্য ইংরেজের অধীনে সুদীর্ঘ দেড়শত বৎসরকাল বাস করিয়াও কি আজ ব্যবসায়ী ও বেশীর ভাগ ইংরাজীনবীশ বাক্‌সর্ব্বস্ব অ-ব্যবসায়ী মিলিয়া চীৎকার করিলে তাহাই ফিরিয়া পাওয়া যাইবে ? এমন কি, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমেও যে সমস্ত শিল্প ও শিল্পী বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় দেখা দিয়াছে আজ তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদের অনুসন্ধানের বিষয়।

কেন এমন হইল ? কে এমন করিল ? যাহা ছিল, তাহা গেল কিসে ? সে কথা তুলিলে নাকি গরল উঠিবে। আমরা গরল তুলিতে চাই না। কেননা, বাঙ্গলায় নীলকণ্ঠ কেহ নাই। কিন্তু এত যে দলিত, মর্দ্দিত ও মন্থিত হইতেছি, তবু যে অমৃত কেন উঠিতেছে না, কি করিয়া বলিব ? শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি অথচ বাঙ্গালীর পেটে ভাত নাই ! বাঙ্গলার নরনারী জঠরানলে পুড়িয়া মরিতেছে। চিতার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে !

আমরা কি স্বখাদ-সলিলে ডুবিয়া মরিলাম ! আমরা কি নিজের পায়ে নিজেরা কুড়াল মারিলাম ! কেন আমাদের এ দুর্ব্বুদ্ধি হইল ?

আমরা কি আবার বাঁচিতে পারি না? যাহা ছিল, তাহা কি আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না?

এমন সুন্দর দেশ,—এত নদী, নদীতে এমন স্রোত, কাননে এমন শোভা, পাখীর কণ্ঠে এমন সুস্বর, আকাশ এমন নীলাভ, এখানে যে বাঁচিতে সাধ যায়! এখানে পশুপক্ষী বাঁচিয়া আছে, মানুষ শুধুই মরিবে কেন? মানুষ মারে ও মরে। বাঙ্গালী কাহাকেও মারে না, তবু মরে কেন?

সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে বরেন্দ্রভূমি—বঙ্গভূমির যে পূতোজ্জ্বল আলেখ্যখানি, কবি একদিকে প্রজাশক্তি, অন্যদিকে রাজশক্তির বিপুল সংঘর্ষণের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, —সে ছবি বাঙ্গালীর চিত্তপট হইতে মুছিয়া গেল কেন? বাঙ্গালী গ্রীসের ইতিহাস পড়ে, রোমের ইতিহাস পড়ে। বাঙ্গালী তাহার নিজের ইতিহাস পড়ে না কেন? বাঙ্গলার প্রজাশক্তি কি একদিন অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হইয়া সিংহগর্জ্জনে জল-স্থল-অরণ্যানী প্রকম্পিত করিয়া তুলে নাই? বাঙ্গলার ইতিহাস-বিশ্রুত পালসাম্রাজ্য কি প্রজাবৃন্দের নির্ব্বাচনের উপরেই বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই? "বাঙ্গালীর এই সাম্রাজ্য কি ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার, কীর ও পাঞ্চাল দেশের উপর বাহুবলে আধিপত্য লাভ করে নাই? সাম্রাজ্যের রণতরীসমূহ কি ভাগীরথী-প্রবাহ আচ্ছন্ন করিয়া সেতুবন্ধ-নিহিত শৈলশিখর-শ্রেণীরূপে অবস্থিতি করিত না? অসংখ্য মদমত্ত রণকুঞ্জর-নিকর জলদজালবৎ প্রতিভাত হইয়া কি দিনশোভাকে শ্যামায়মান করিত না? উত্তরাঞ্চলাগত বহু মিত্র ও করদ রাজন্যবর্গের উপঢৌকনীকৃত অসংখ্য

অশ্ববাহিনীর দ্রুতখুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিপটল-সমাবেশে দিঙ্‌মণ্ডলের অন্তরাল কি নিরন্তর ধূসরিত হইয়া থাকিত না? বঙ্গসম্রাটের সেবার্থ সমাগত সমস্ত জম্বুদ্বীপাধিপতিগণের অনন্ত-পদাতি-পদভরে বসুন্ধরা অবনমিত হইয়া পড়িত না? অসংখ্য পরাজিত শত্রুনরপালগণের মুকুটসমান্বিত স্বর্ণনির্ম্মিত সিংহমূর্ত্তি সমুচ্চ প্রাসাদ-শিখরে সংস্থাপিত হইয়া, গ্রাস-ত্রাস-সন্ত্রস্ত চন্দ্রমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী বিম্বাঙ্করূপী মৃগকে কি পলায়নপর করিবার উপক্রম করিত না? বাঙ্গলার সম্রাট যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন, তখন সেনা-ভারাক্রান্ত বিচলিত পর্ব্বতমালা বক্রভাব প্রাপ্ত হইত; পাতালে বাসুকীর শির সঞ্চালিত, সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত;—বাসুকি মস্তকে বেদনা অনুভব করিত —বেদনা নিবারণের জন্য হস্তোদ্গম করিতে বাধ্য হইত। রাজসেনাপতিগণের দিগ্বিজয়-বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র—উৎকলাধীশ অবসন্ন হৃদয়ে রাজধানী পরিত্যাগ করিতেন,—আর প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধীশ্বর রাজাদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া সন্ধি-বন্ধন করিতেন। বাঙ্গালীর বিজয়গৌরবে—দাক্ষিণাত্যের শিল্পরুচি অতিক্রান্ত হইয়াছিল, লাটদেশের কমনীয় কান্তি আবিল হইয়াছিল, অঙ্গদেশ অবনত হইয়া পড়িয়াছিল, কর্ণাটের লোলুপদৃষ্টি অধোমুখে অবস্থিত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, মধ্যদেশের রাজ্যসীমা সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল।"

ইহা কি সত্য? ইহা কি ইতিহাস? বাঙ্গলায় কি ইহা একদিন সম্ভব হইয়াছিল?

কবি কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। কাব্য কি ইতিহাস? রাজা ও প্রজার সংঘর্ষণ-মূলক যে সকল কথা কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে, সমসাময়িক উৎকীর্ণ লিপি দ্বারা তাহা বহু অংশে প্রমাণীকৃত

হইয়াছে। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী কাব্য লিখিতে গিয়া ইতিহাস লিখিয়াছেন; ইতিহাস লিখিতে গিয়া কাব্য লিখিয়াছেন। তিনি নিজেই নিজের গ্রন্থের সম্যক পরিচয় দিয়াছেন।

"স্তোকৈকস্তোষিত লোকৈঃ শ্লোকৈরক্লেশনশ্লেষৈঃ।
ঘটনাপরিস্ফুট রসৈঃ গম্ভীরোদার ভারতীসারৈঃ॥"

রামচরিত কাব্য হইলেও,—প্রজাশক্তির বিরুদ্ধে রাজশক্তির পুনরভ্যুদয়ের এক সুস্পষ্ট ইতিবৃত্ত। এই কাব্য 'ঘটনাপরিস্ফুটরসে' পরিপূর্ণ। এই কাব্য বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর ইতিহাস,—ইতিহাসের এক বড় অধ্যায়। অষ্টম শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে ভীষণ অরাজকতা ("মাৎস্য ন্যায়") দেখা দিয়াছিল। উৎপীড়িত বাঙ্গালী প্রজাবৃন্দ মিলিত হইয়া গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিল। এই পালবংশের এক রাজা মহীপাল 'অনীতিক' আচরণে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার দুই ভ্রাতা শূরপাল ও রামপালকে কারাগারে আবদ্ধ করেন। বাঙ্গলার প্রজাশক্তি রাজবংশের এই অনীতিক আচরণের প্রতিবাদ করে। কেননা, কনিষ্ঠ রামপাল "সর্ব্বসম্মত" ছিলেন। প্রজার এই প্রতিবাদ বিদ্রোহে পরিণত হয়। বিদ্রোহের ফলে মহীপাল পরাজিত, সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন। প্রজাবৃন্দ কৈবর্ত্তজাতীয় একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে নায়ক করেন। তাঁহার নাম দিব্বোক। দিব্বোকের ভ্রাতা রুদোক ও ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম যথাক্রমে এই বিস্তীর্ণ পালরাজ্য শাসন করেন। পরে রামপাল পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে সক্ষম হয়েন। এই পালদিগের রাজত্ব সময়ে দেবপাল, হিমালয় হইতে বিন্ধ্য এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত রাজ্যগুলি করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই

দেবপাল উৎকল-কুল উৎকিলিত করিয়াছিলেন, হূনগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন, দ্রাবিড় গুর্জ্জরনাথের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন, সমুদ্র মেখলাভরণা বাঙ্গলাদেশ উপভোগ করিয়াছিলেন। এতবড় একটা বৃহৎ সাম্রাজ্যের কিসে অধঃপতন হইল? প্রজার সম্মতিতে যাহার অভ্যুদয়, প্রজার অসম্মতিতেই কি তাহা বিনষ্ট হইল? পালসাম্রাজ্যের সিংহদ্বারের সম্মুখে সেদিন ত বখ্‌তিয়ার অশ্ববিক্রয়ের অছিলায়, সতেরটি অশ্ব লইয়া আসিয়া উপনীত হয় নাই। অশীতিপরবৃদ্ধ রাজার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ত রাজকর্ণে কোন আত্মঘাতী ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিধ্বনিত করেন নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর কুয়াসাচ্ছন্ন প্রভাত ত তখন অনেক দূরে। তবে কি কোন মোগল পালসাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য হিন্দুকুলাঙ্গার মানসিংহকে বাঙ্গলায় প্রেরণ করিয়াছিল? পালদিগের রাজত্ব সময়েও কি বাঙ্গলায় ভবানন্দ ছিল? অথবা পালসাম্রাজ্যের জীর্ণ দ্বারে ক্লাইব আসিয়া আঘাত করিল, সেদিনও কি মীরজাফর ছিল? সেদিনও কি বাঙ্গলায় পলাশীর প্রহসন সম্ভব হইত? অথবা রাঢ়দেশের সীমান্ত হইতে পঙ্গপালের মত অসংখ্য অগণিত পদাতিক তীর, ধনু ও বর্ষা হস্তে ধাবিত হইয়া বরেন্দ্রভূমির ইতিহাসবিশ্রুত সেই বিরাট সাম্রাজ্যকে এক নিমেষে ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিল? কিসে বাঙ্গালী এতবড় একটা সাম্রাজ্য হারাইল?

সেই সুদূর অতীতে জন্মভূমি বঙ্গভূমি, কবির চক্ষে কি মনোরম প্রতিভাত হইত! কবি মুগ্ধনেত্রে বরেন্দ্রভূমির অনুপম সৌন্দর্য্য চাহিয়া দেখিলেন, আর ভক্তিবিহ্বল চিত্তে জন্মভূমির বন্দনাগীতি গাহিয়া উঠিলেন।

"দরদলিত-কনক-কেতক কান্তিমপ্যশেষ কুসুমহিতাম্।
অরবিন্দেন্দীবরময়-সলিল-সুরভি-শীতল-শ্বসানাং ॥"

ইহাই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের "বন্দেমাতরং" গীতি। বাঙ্গালী হাজার বৎসর এই গান ভুলিয়া গিয়াছিল। আবার কি সে গান গাহিতে পারিবে? আবার কি বাঙ্গলার কবি যুক্তকরে গদগদকণ্ঠে জন্মভূমিকে—সম্ভাবিতাকলুষভাবাং—উপপাদিতব্রতোৎকর্ষাং—অপরিমিত পুণ্যভূমিং,—সত্যাচারৈক-কেতনং—ব্রহ্মকুলোদ্ভবাং,—গঙ্গা-করতোয়ানর্ম্মপ্রবাহপুণ্যতমাং—অপুনর্ভবাহ্বয় মহাতীর্থবিকলুষ-উজ্জলাং—বলিয়া ডাকিতে পারিবে? যে ভূমির অধিবাসিগণ নানা সদ্‌গুণের আধার ছিল, যেখানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেন, যাহার দুই পার্শ্বে গঙ্গা ও করতোয়া এবং মধ্যে অপুনর্ভবা নদী প্রবাহিত থাকায় পুণ্যতম ভূমি বলিয়া বিবেচিত হইত, আজ বাঙ্গালীর কোন্ পাপে সেই পুণ্যভূমির কপাল পুড়িয়া গেল?

যেকলে যাহাই বলুক,—বাঙ্গালী একটা জগজ্জয়ী ও জগদ্বরেণ্য জাতি ছিল। আজ এই শ্মশান দেখিয়া কি বুঝিতে পারিতেছ না? পাল ও সেন রাজাদিগের সময়েও ভাস্কর্য্যের যে নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে,—তাহা কি শশ্মানে সোনার প্রদীপের মত জ্বলিয়া উঠিতেছে না? ধীমান ও বীতপাল বাঙ্গলায় পূর্ব্বদেশীয় এক শ্রেণীর অভিনব শিল্পাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা (Founder of "the Eastern School" of Indian Art) বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারেন কি, না—তাহা লইয়া আপাততঃ কিছুদিন তর্ক চলিতে পারে সত্য; কিন্তু পাল ও সেন-রাজদিগের সময়ের যে সমস্ত প্রস্তর ও ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে,

তাহা হইতে বাঙ্গলার একটা বিশেষ শ্রেণীর শিল্পাদর্শ, বঙ্গীয় প্রতিভার সৃষ্টি বলিয়া, নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিতে পারা যায়। কে জানে, বাঙ্গলা, একদিন মগধ ও উৎকলকেও শিল্পাদর্শ দিয়াছিল কি না?

বাঙ্গালী তাহার শিল্পে কিসের আদর্শ সেদিন ফুটাইয়া তুলিয়াছিল? তাহার আকৃতিগত আদর্শের অন্ধ ও নিষ্ফল অনুকরণ-চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া আমরা কি তাহার প্রকৃতিগত আদর্শের সহিত আমাদের আধুনিক প্রকৃতির সাদৃশ্য ও বৈষম্যের তুলনা করিয়া দেখিব না? সহস্র বৎসর পূর্ব্বের শিল্পসাধক—বাঙ্গালীর মনের যে পরিচয় প্রস্তরে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে,—তাহা কি আজ বাঙ্গালীর অনুসন্ধান-যোগ্য নহে? সাহিত্যে, ধর্ম্মে ও সমাজ-বিন্যাসে যে জাতীয় চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গলার স্থপত্যে ও ভাস্কর্য্যে তাহা আরও অধিকতর দেদীপ্যমান বলিয়া প্রমাণীকৃত হইবে। সম্প্রতি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির একখানি বিবরণীর মধ্যে আমরা আরও কতকগুলি প্রস্তরে খোদিত দেবদেবীমূর্ত্তির প্রতিলিপি দেখিতে পাইলাম। যতগুলি স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন উদ্ধার করা হইয়াছে,—এ পর্য্যন্ত কেহই তাহা রীতিমত গবেষণা করিয়া শিল্পের এই বিভাগে বাঙ্গালীর প্রতিভার বিশেষত্ব দেখাইতে সক্ষম হন নাই। শীঘ্রই কেহ এই কার্য্যে অগ্রসর হইবেন, এমন আশা করা যায়। কিন্তু আমরা বিশেষজ্ঞ না হইয়াও যতদূর বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে মনে হয়, বাঙ্গালী যেমন সভ্যতার অন্যান্য বিভাগে, তেমনই শিল্পসাধনাতেও তাহার জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যকে

সম্যক ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। বাঙ্গলার স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে বাঙ্গালীর একটা বিশেষত্ব আছে।

দেবদেবীমূর্ত্তিস্রোতে বাঙ্গালী একদিন ভাসিয়া গিয়াছিল। সেদিন বাঙ্গলার প্রাণে রস ছিল। রস শিল্পসাধনায় মূর্ত্তি পাইয়াছিল। দেখ, দেবদেবীমূর্ত্তিতে যৌবন কেমন উছলিয়া পড়িতেছে! সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যৌবনের পরিপূর্ণতায় ঢল ঢল করিতেছে। জাতীয় মন তখনও জরাগ্রস্ত হয় নাই। হইলে, শিল্পী কখনও এমন মূর্ত্তি গড়িতে পারিত না। বাঙ্গলার এই দেবদেবীমূর্ত্তি দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়। শুধু চক্ষু নয়—প্রাণও জুড়ায়। এই মূর্ত্তিগুলির দাঁড়াইয়া থাকিবার ভঙ্গী যদি নিরীক্ষণ কর, তবে বুঝিতে পারিবে যে, বাঙ্গালী সেদিন পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইতে জানিত। যদি চলিবার ভঙ্গী দেখ, তবে বুঝিতে পারিবে যে, বাঙ্গালী সেদিন পলায়ন না করিয়াও চলিতে জানিত। প্রশস্ত ললাট,—হস্তে বিচিত্র আয়ুধ-বিন্যাস,—চক্ষে উদার সরল দৃষ্টি,—বক্ষে সিংহের সাহস—যে জাতি এই সমস্ত মূর্ত্তি খোদিত করিয়া গিয়াছে—তাহারা কি বাঙ্গালী ছিল? যদি তাহারা বাঙ্গালী ছিল—তবে আমরা কি? আর যদি আমরা বাঙ্গালী হই—তবে তাহারা কে?

বাঙ্গলা, হিন্দু ও মুসলমানে ভাগাভাগি হইয়া যাইবার পূর্ব্বে, অষ্টম হইতে দ্বাদশ—অন্ততঃ এই পাঁচটী শতাব্দীর কথাও যদি আমরা আজ একবার স্মরণ করি,—তবে নিশ্চয়ই দেখা যাইবে যে, গ্রীস ও রোম হইতে যদ্যপি আধুনিক বাঙ্গালীর অনেক শিক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় থাকে, তথাপি, যে বাঙ্গলায় মুসলমান-শাসনে

বৈষ্ণব, ও খৃষ্টান-শাসনে ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের জন্ম হইয়াছে, সে বাঙ্গলার পক্ষেও সভ্যতার প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই আদর্শ যোগাইতে পারে, পাল ও সেন-রাজত্ব এমন বিস্তর উপাদানে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

আমরা কি অরণ্যে রোদন করিতেছি? বঙ্কিমচন্দ্র কি অরণ্যে রোদন করিয়া গেলেন? মা যদি ঐ পশ্চিম সমুদ্রের লবণাম্বুরাশির অতল গর্ভেই নিমজ্জিত হইয়া থাকেন, তবে আমরা কি আর মাকে উঠাইয়া আনিতে পারিব না? শস্যশ্যামলা জন্মভূমি —তোমার কোটী কোটী সন্তান আজ এই দীপ্ত চৈত্রমধ্যাহ্নে শুষ্ককণ্ঠ মরণ-আতুর। মা অন্নপূর্ণা! বাঙ্গালী কি আজ একমুঠো ভাতের জন্য এমনই করিয়া ধুঁকিতে ধুঁকিতে মরিয়া যাইবে?

বাঙ্গালী আরও অনেকবার মরিয়াছে। কিন্তু এমনই করিয়া সে বুঝি আর কখনও মরিতে বসে নাই।

আজ বাঙ্গালীর অনেক ভাবিবার কথা আছে। অনেকে অনেক দিক হইতে বাঙ্গালীর কথা ভাবিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, ইউনিভার্সিটির শিক্ষা বন্ধ করিয়া দাও; আইন-কলেজটাকে একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া ফেল। যদি ইংরাজের কাছে কিছু শিখিতেই হয়, তবে বিজ্ঞান শিক্ষা কর; ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রসর হও। কেহ বলিতেছেন, সমগ্র মুসলমান-সমাজে যে সাম্যবাদ বিদ্যমান,—হিন্দুসমাজে তেমনই একটা একাকার-মূলক সাম্যবাদ প্রচলিত না হইলে,—হিন্দুগণ আর কুড়ি বৎসরের মধ্যেই প্রায় নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। সমস্ত বাঙ্গলায় যদি দুই কোটী হিন্দু থাকে, তবে দুই কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ মুসলমান।

মুসলমান-যুগেও হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা দশ আনা, ছয় আনা ছিল। আজ উল্টা দিকে দশ আনা, ছয় আনা হইয়াছে। আজ মুসলমান দশ আনা, হিন্দু ছয় আনা। খৃষ্টান-যুগে দুই তিন হাজার লোক ব্রাহ্ম হইয়াছে,—ইহা বিশেষ ভাবিবার কথা নয়। একটা বৃহৎ যুগে, একটা বড় ব্যাপারে অমন সামান্য বাজে খরচ কিছু হইয়া থাকে। কিন্তু খৃষ্টান-যুগে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান হইয়া গেল কেন? এখনও যাইতেছে কেন? যাহারা মুসলমান হইয়াছে ও হইতেছে, তাহারা কি সকলেই হিন্দু ছিল? যদি তাহারা রীতিমত হিন্দু ছিল না, এই কথাই বলা হয়, তবে মুসলমানগণ তাহাদিগকে টানিয়া লইলেন,—হিন্দুরা তাহাদিগকে টানিয়া লইল না কেন,—এতদিন লয় নাই কেন? ইহা কি হিন্দুদিগের করা সঙ্গত ছিল না? হিন্দুর কাজ হিন্দুকেই করিতে হইবে,—সেজন্য যাহারা "হিন্দু নই বলিতে প্রস্তুত," তাঁহাদের উপর নির্ভর করিলে ত চলিবে না।

'আমরা সমস্ত হিন্দু এক',—এই রকম একটা কথার প্রতিধ্বনি আমরা ক্রমশঃই সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পাইতেছি। দুই কোটী হিন্দুর মধ্যে বাঙ্গলায় এক কোটী এগার লক্ষের জল অনাচরণীয়, তাহারা অস্পৃশ্য। তাহারা শুধু সৎ-ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য নয়। ব্রাহ্মণ যাহাদিগকে শূদ্র বলেন,—রঘুনন্দন যাহাদিগকে শূদ্র বলিয়াছেন,—সেই সমস্ত শূদ্রেরও তাহারা অস্পৃশ্য! এই সমস্ত অস্পৃশ্য জাতি সকলের মধ্যে সুবর্ণ-বণিক আছেন, সাহা-বণিক আছেন,—আবার রাজবংশী আছেন, নমঃশূদ্র আছেন, জেলে কৈবর্ত্ত আছেন। ইহা ব্যতীত আরও বহুতর জাতি আছেন।

বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণশূদ্র-ভেদ অপেক্ষা, শূদ্রে শূদ্রে ভেদই অধিকতর মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। অনেক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বলিতেছেন, এই পার্থক্য নিতান্ত কাল্পনিক,—ইহা বস্তুতঃ উন্নতির অন্তরায় নয়। পুরাকালেও এই পার্থক্য বিদ্যমান ছিল ;—ইহা অপরিহার্য্য। এ পার্থক্য সত্ত্বেও বাঙ্গালী জাতি উচ্চ আদর্শকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল।

ব্রাহ্মণসভা অন্যদিকে দ্বারবঙ্গাধিপতিকে ডাকিয়া আনিয়া পুনঃ পুনঃ আমাদের কর্ণবিবরে প্রাচীন বর্ণাশ্রমের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। নিতান্ত আগ্রহের সহিত পূর্ব্বজন্ম ও কর্ম্মফলের তত্ত্বকথা শুনাইয়া আশ্বাস দিতেছেন। আদম-সুমারীর বিবরণ পাঠ করিলে মনে হয়, বাঙ্গলার জল-অনাচরণীয়,—এমন কি জল-আচরণীয় জাতিসকলও ব্রাহ্মণসভার পূর্ব্বজন্ম ও কর্ম্মফলের কথা বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছেন না। কিন্তু ইহা শুধু তাহাদের শ্রবণশক্তির দোষ বলিয়া ব্রাহ্মণগণের পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকাও কোন ক্রমেই নিরাপদ নয়। ইহারা যদি সকলে মিলিয়া ব্রাহ্ম হইয়া যাইত, তবে আপদ সহজেই দূর হইত। একদিকে থাকিতেন কতিপয় ব্রাহ্মণ, আর দুই কোটী হিন্দুর মধ্যে প্রায় সমস্ত অংশটাই ব্রাহ্মণের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া হইত ব্রাহ্ম। বৌদ্ধযুগের আবার একটা পুনরাভিনয় দেখা যাইত। কিন্তু বৌদ্ধদের যে শক্তিসামর্থ্য ছিল, ব্রাহ্মদের তাহা নাই—হইবে না। বৌদ্ধবিপ্লবের পুনরাভিনয় কতকটা পাঠান-যুগে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অভ্যুত্থানে দেখা গিয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব যথাক্রমে হিন্দুর বর্ণাশ্রমের নিকট মস্তক অবনত

করিয়াছে। ব্রাহ্ম সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও,—তাঁহারাও তাহাই করিয়াছে ও করিতেছে। জল অনাচরণীয় জাতিগণ ব্রাহ্ম হইতে চাহেন না। তাঁহারা বর্ণাশ্রমের বিরোধী নহেন। কিন্তু যে জাতি যে বর্ণে আছেন, সেই বর্ণে আর তাঁহারা কিছুতেই থাকিতে প্রস্তুত নহেন। এ ক্ষেত্রে বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত আলস্যে কালক্ষেপণ করিলে, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিবে না। ব্রাহ্মণ, পাঠান ও মোগল-যুগেও হিন্দু-সমাজকে ব্যবস্থা দিয়া তাহাকে পরিচালিত করিয়াছে। খৃষ্টান-যুগে যদি ব্রাহ্মণ সময়োপযোগী ব্যবস্থা দিতে কৃপণতা করেন,—তবে যে ওলট পালট দেখা দিয়াছে—ইহাতে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। ব্রাহ্মণ নগণ্য তুচ্ছ হইয়া যাইবেন, কায়ক্লেশে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিবেন মাত্র। কিন্তু এরূপ নগণ্যভাবে অস্তিত্বের জীর্ণ ভার বহন করা কি এ যুগের ব্রাহ্মণের পক্ষে শ্লাঘার বিষয় হইবে? নমঃশূদ্র এগার দিনে অশৌচ গ্রহণ করিয়াছেন, উপবীত ধারণ করিয়াছেন,—সংখ্যায় আবার তাঁহারা দুই এক লক্ষ নহে, অনেক লক্ষ নমঃশূদ্র ব্রাহ্মণকে জল-অনাচরণীয় করিয়াছেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণের ছোঁয়া জল খান না। তাঁহারা বলেন, ব্রাহ্মণগণ কায়স্থের জল খাইয়া ব্রাত্য হইয়াছে। কায়স্থ শূদ্র। আমরা ব্রাহ্মণের জল ব্যবহার করিব না। * * * ইহা কিসের চিহ্ন? ইহার ভবিষ্যৎ কোথায়? ইহা যদি বাঙ্গালীর ভাবিবার কথা না হয়, ত ভাবিবার কথা কি? বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ, তুমি কি এখনও বুঝিতেছ না? এই আসন্ন সমাজবিপ্লবে কি তুমি পঙ্গুর মত দাঁড়াইয়া থাকিবে?

বাঙ্গলা আজ তাহার ব্রাহ্মণের দ্বারে করযোড়ে একটা ব্যবস্থার জন্য দণ্ডায়মান। এমন সুযোগ হেলায় উপেক্ষা করিলে, কে জানে ব্রাহ্মণের ভবিষ্যৎ কোথায়, হিন্দুর ভবিষ্যৎ কোথায়, বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ কোথায় ?

তাহার পর অন্নসমস্যা। সকল সমস্যার বড় সমস্যা। সকল প্রকার বীভৎস সামাজিক বিপ্লবের মূলীভূত কারণ এই অন্নসমস্যা। কর্ত্তৃপক্ষ, চাউলের রপ্তানী বন্ধ করিবার কথা বলিতেছেন। কারেন্সি আইন শোধরাইয়া দিয়া আংশিক ভাবে দুর্ম্মূল্যতার একটা কারণ দূর করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন। কিন্তু সাহেব ও মাড়োয়ারী বণিকের হস্ত হইতে বাঙ্গলাকে রক্ষা করা বুঝি আর গভর্ণমেণ্টেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। মূর্ত্তিপূজা উঠাইয়া দিলে কি চাউলের দাম সস্তা হইবে ? জাতিভেদ উঠাইয়া দিলে, বিধবাদের বিবাহ দিলে, কি বস্ত্রের দাম কমিবে ? বোধ হয়, বাঙ্গালী আজ সব করিতে প্রস্তুত।

বাঙ্গলার বিশেষতঃ পূর্ব্ববাঙ্গলার একটা বড় ব্যবসা—পাট। স্থানীয় মিলের মালেক সাহেব। সাহেবেরা বাঙ্গালীর হাতে পাট খরিদ করা বন্ধ করিয়াছে। বাঙ্গালী পাটের মহাজন একে মূর্খ—তাহাতে যৌথকারবার-বিমুখ। কাজেই প্রাকৃতিক নিয়মে তাহারা ঝড়ের মুখে শুষ্ক তৃণের মত উচ্ছন্নের আকাশে উড্ডীয়মান। পাটের ব্যবসার ক্ষতিতে পূর্ব্ব-বাঙ্গলার এক ধনাঢ্য বণিকসম্প্রদায় মরণোন্মুখ। পূর্ব্ব-বাঙ্গলার কৃষক অন্নহীন, বস্ত্রহীন—পথের ভিখারী। পৃথিবীর এতবড় একটা একচেটিয়া ব্যবসা এতকাল যাহাদের হাতে ছিল, তাহারা কতবড় মূর্খ হইলে আজ এমনই

করিয়া দেশকে ডুবাইয়া নিজেরা ডুবিতে পারে? কেহ বলিতেছেন—আমাদের দেশের মাটীতে পাট জন্মে, আমরা যদি পাট না বেচি, সাহেবেরা কোথায় পাট পাইবেন, আমরা সাহেবদের পাট বেচিব না। কিন্তু সর্ব্বশেষে দাঁড়ায় এই—বিড়ালের গলায় কে ঘণ্টা বাঁধিতে যাইবে? আবার কেহ বলেন,—এবারে বীজের জন্য যত পাটের বীচি আছে—এস, সকলে মিলিয়া তাহা কিনিয়া পুড়াইয়া ফেলি। আগামী বৎসর আর পাটের চাষ হইতে পারিবে না। কাজেই সাহেবেরা আমাদের এই পাট বাধ্য হইয়া কিনিবেন। কেহ বলিতেছেন,—চল, জমীদারের শরণাপন্ন হই। তাঁহারা প্রজাদের ডাকিয়া বলিয়া দিউন যে, আগামী বৎসর কৃষক আর পাটের চাষ না করে।

অন্যদিকে প্রজা বলিতেছে,—আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চাইনা। আমরা সশরীরে গভর্ণমেণ্টের খাস তালুকের প্রজা হইতে চাই। জমীদার অত্যাচারী। জমীদার কৃষি-বাণিজ্যে কোনই সহায়তা করে না। জমীদার বলিতেছেন—যে, নূতন-সংস্কারে তাঁহাদের স্থান একেবারেই নাই। এ বড় অন্যায়। জমীদারের স্বার্থ কেহই দেখে না! জমীদারই বাঙ্গলার গৌরব। অতএব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যেন অনন্তকাল স্থায়ী হয়। ইহার সকলই বাঙ্গালীর ভাবিবার কথা। তাই যুগসন্ধিক্ষণে বাঙ্গলার বিভিন্ন অবস্থান-স্তরে অবস্থিত হিন্দু ও মুসলমান সকল বাঙ্গালীকেই আমরা ডাকিয়া বলিতেছি,—উঠ—জাগ,—জাগাও। সন্ধিপূজার আর দেরী নাই।

চৈত্র, ১৩২৬ সাল

বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব

বাঙ্গালীর মা কে? 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু',—তিনিই বাঙ্গালীর মা।

বাঙ্গালী মাকে ডাকিয়া ঘরে আনে, ঘরে আনিয়া পূজা করে, পূজা-শেষে আবার মাকে ক্ষ্যাপা শিবের সঙ্গে কৈলাসে পাঠাইয়া দেয়। মা কৈলাসে চলিয়া যায়। মায়ের পায়ের জবা, ঢেউয়ের মাথায় নাচিতে নাচিতে, নদীর স্রোতে ভাসিয়া যায়।

বাঙ্গালী সংবৎসর পরে মাকে আবাহন করে,—আবার বিসর্জ্জন দেয়। এই আবাহন ও বিসর্জ্জন বৎসরের পর বৎসর,—এমনি কত শত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। মা আসে, মা চলিয়া যায়;—মা আবার আসে, মা আবার চলিয়া যায়। মা নিত্যকাল আসিতেছে, নিত্যকাল চলিয়া যাইতেছে। মায়ের এই আসা-যাওয়ার নিত্যলীলার মধ্যে, বাঙ্গালীর কত কি কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তি কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালীর মা শক্তিরূপিণী। শক্তির প্রকট লীলা—গতি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কম্পিত করিয়া, ইহার প্রতি অণু-পরমাণুকে সন্ত্রস্ত করিয়া, ঐ গ্রহ-নক্ষত্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, চন্দ্রে-সূর্য্যে জ্বলিয়া জ্বলিয়া, নিত্যকাল মহাকালের বুকের উপর দিয়া মা একবার আসিতেছেন, আবার চলিয়া যাইতেছেন;—আবার আসিতেছেন, আবার চলিয়া যাইতেছেন। বাঙ্গালীর মায়ের এই আবাহন ও বিসর্জ্জন, —ভ্রান্তি নয়,—ইহা অভ্রান্ত, ইহা শাশ্বত, ইহা ধ্রুব সত্য। যে

বলিয়াছে যে, বাঙ্গালীর মায়ের এই আবাহন ও বিসর্জ্জন ভ্রান্তি,—সে সন্তান নয়, সে বাঙ্গালী নয়,—সে মাকে দেখে নাই। সে যদি মাকে দেখিত, মায়ের এই রূপ—এই অপরূপ রূপ যদি সে একবার চক্ষে দেখিত, তবে সে এই রূপের মধ্যেই অরূপকে পাইত, মায়ের এমন রূপকে ছাড়িয়া, কোন মিথ্যা অরূপের আলেয়ায় ভুলিত না। বাঙ্গালীর দীর্ঘ একটা শতাব্দীও বুঝি বা এমনি করিয়া নষ্ট হইত না।

মা চলিয়া গিয়াছিল। মণ্ডপ শূন্য পড়িয়া ছিল। তবু প্রতি সন্ধ্যায় ঐ শূন্যমণ্ডপের বেদীতে আমরা একটি সলিতা জ্বালিয়া দিয়াছি। ঐ শূন্য বেদীর উপর মা একদিন দশদিকে দশভুজ প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সমস্ত বাঙ্গলা দেশ নিনিমেষ আঁখিতে সে দিন মাকে চাহিয়া দেখিয়াছিল! বাঙ্গলায় সে দিন কে সে অন্ধ, যে চাহিয়া দেখে নাই?

আবার মা আসিতেছেন। আঁধার ঘর আলো করিয়া মা দাঁড়াইবেন। তিন দিন বাঙ্গলায় অন্ধকারের রাজত্ব থাকিবে না। এই শ্মশানে তিন দিন, তিন রাত্রি সোনার প্রদীপ জ্বলিবে। তার পর আবার অন্ধকার আসিবে। অন্ধকারে সমস্ত ঢাকিয়া দিবে। সে অন্ধকার ভেদ করিয়া কি দেখিবে,—কে দেখিবে? রুদ্ধ নিশ্বাস ও চাপা কান্না কে শুনিবে?—বাঙ্গালী সহজে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতে পারে না, বাঙ্গালী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেও পারে না। বাঙ্গালী সংবৎসর এই দুঃখে কাটায়। আর এক গভীর দিগন্তবিস্তৃত অন্ধকার বাঙ্গালীর দুঃখকে ঢাকিয়া রাখে। বাঙ্গালীর দুঃখ কেহ দেখিতে পায় না।

দুঃখের কৃষ্ণচ্ছায়াতলে, বিল্ববৃক্ষমূলে, মায়ের আবাহন। কোটী কোটী বাঙ্গালীর চক্ষের জলে মায়ের বিসর্জ্জন।

মা আসে, মা চলিয়া যায়; কিন্তু বাঙ্গালীর দুঃখ ত ঘুচে না। তবে কি মা আসে না? আমরা কি শুধু খড়, কাঠ, আর রং-মাখান মাটী লইয়া খেলা করি? বাঙ্গালী যে সংবৎসর পরে, 'ইহাগচ্ছ' বলিয়া ডাকে,—সে ডাক কি মা শুনে না? মা সন্তানের ডাক শুনে না,—এ কেমন মা? পাষাণীর মেয়ে মা, কি এতই পাষাণ? একটা জাতির মা কি নিশ্চিন্ত আলস্যে এতকাল ধরিয়া নিদ্রা যাইতে পারে?

আজ মা আসিবে। বাঙ্গালী মাকে কি কথা বলিবে? দুঃখে দুঃখে তাহার বৎসর কাটিয়াছে। আধপেটা খাইয়া সে কোন রকমে জীবনে বাঁচিয়া আছে। কটিতে শতচ্ছিন্ন জীর্ণ আচ্ছাদন জড়াইয়া কোন মতে লজ্জা নিবারণ করিতেছে। একটা জাতির মা, তাঁর সন্তানদের কাছে সংবৎসর পরে এ কথা শুনিয়া, এ দৃশ্য দেখিয়া কি বলিবে? মায়ের কাছে সন্তানের কত কথাই বলিবার থাকে। সত্যই—আজ বাঙ্গালী মাকে কি বলিবে?

বাঙ্গালী, তুমি কি জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ? এমন অসহায় তুমি কবে ছিলে, তোমার অতীত ইতিহাসে ত খুঁজিয়া পাই না। আজ আর তুমি মিথ্যা বলিও না। মন মুখ এক করিয়া অন্ততঃ একবার আজ মাকে বল যে, তোমার এ জীবন সত্যই দুর্ব্বহ। মাকে বল যে, তুমি ক্ষুধায় খাদ্য পাও না, কটিমাত্র লজ্জা নিবারণ করিতে একখানা শতচ্ছিন্ন বস্ত্রও পাও না, রোগে চিকিৎসা পাও না,—জীবনে মুমূর্ষু তুমি—কোনই প্রতীকার পাও না।

হে বীর, একবার সাহস অবলম্বন কর। ভয় কি?—মাকে সত্য কথা বলিলে, সন্তানের দুঃখ—মা কি দূর করিবেন না? বাঙ্গালীর মা কি মানুষের মা নয়? তাও কি কখনও হয়? অবশ্যই মা সন্তানের দুঃখ দূর করিবেন।

বাঙ্গালী আমরা শব্দের ঝঙ্কারে, বাগ্‌বিভূতির দাপটে, প্রাণের কথা, মুখে সরল ভাষায় বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা যাহা ভাবি,—তাহা বলিতে পারি না; এবং যাহা বলিতে পারি না—তাহা ক্রমে ভাবিতেও পারি না। এমনি করিয়াই বাঙ্গালী ভাবে ও ভাষায়, মনে ও মুখে—আজ ভণ্ড হইয়া পড়িয়াছে; এমনি করিয়াই বাঙ্গালী তাহার প্রাণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে; এমনি করিয়াই বাঙ্গালী ধীরে ধীরে আজ এক শতাব্দী ধরিয়া আত্মহত্যা করিতেছে। বাঙ্গালীকে কে বুঝাইয়া দিবে যে, আত্মহত্যা মহাপাপ?

আজ বাঙ্গলায় যে প্রভাত আসিয়াছে, সে কত যুগ-যুগান্তের এমনি কত শারদ প্রভাতের পুণ্যস্মৃতিকে বহন করিয়া আনিয়াছে। অতীতের কত শিশুর হাসি, কত জননীর স্নেহ—কত নব-দম্পতির প্রেম এই স্নিগ্ধ প্রভাতের বাতাসে নিশ্বাস ফেলিতেছে। আজিকার এই প্রভাতে,—অতীতের কত প্রভাতের ইতিহাস আমি পড়িতেছি। বাঙ্গালীর ত এই প্রথম প্রভাত নয়। তবু এই প্রভাত,—এই স্নিগ্ধোজ্জ্বল শারদপ্রভাত,—বাঙ্গলার প্রভাত,—বাঙ্গালীর প্রভাত,—কোন দৃঢ়বদ্ধ লৌহকবাট খুলিয়া দিয়া, বাঙ্গালী গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে মুক্ত আকাশের তরুণ-অরুণ-দীপ্তি ছড়াইয়া দিবে,—এবং দিবে কি না, তাহাই ভাবিতেছি। জগতের প্রভাত

কি বাঙ্গালীর প্রভাত নয়? বাঙ্গালীর প্রভাতেও কি অন্ধকার? অন্ধকার আর অন্ধকারে, শ্মশানের প্রেতভীতি!

মা আনন্দময়ীর আগমনে বাঙ্গলার নদ-নদী, মাঠ-ঘাট, কানন-প্রান্তর, আকাশ-বাতাস আনন্দে ভাসিয়া যাইতেছে। আজ তিন দিন তিন রাত্রি বাঙ্গালী তাহার শ্মশানে সোনার প্রদীপ জ্বালিবে। বাঙ্গালী সন্তান-গৌরবে মার কোলে বসিবে।—বাঙ্গালী মাকে তাহার সংবৎসরের দুঃখের কথা বলিবে। সুখ? বাঙ্গালীর সুখ ফুরাইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর চক্ষের জল চক্ষে শুকাইয়াছে। বাঙ্গালী মাকে বলিবে,—"মা, যদি পেটে ধরিয়াছিলি, কোলে জন্ম দিয়াছিলি—তবে এই বাঙ্গলার বুকে—মানুষের মত—বাঙ্গালীর মত বাঁচিতে দে।" নমস্তস্যৈ।

আশ্বিন, ১৩২৫ সাল

বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষ

সাহিত্য-তপোবনের কণ্টক আমরা, ঊনবিংশ শতাব্দীর একটা ভ্রান্ত আদর্শের সংঘাত-জনিত কর্কশ বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া যখন তপোবনের শান্তিকে ক্ষুব্ধ করিতেছিলাম, সেই সময় বাঙ্গলার চারিদিক্ হইতে কি দারুণ হাহাকারের তপ্ত শ্বাস আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বাঙ্গালী অনেক দিন হইতেই দুই বেলা পেট ভরিয়া খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু কোন মতে জীবনধারণের জন্য, অতি কায়ক্লেশে যে একমুষ্টি অন্ন, বাঙ্গালীর ভাগ্যে আজ তাহাও জুটিতেছে না। বাঙ্গলায় আজ ভীষণ দুর্ভিক্ষের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। প্রতি গৃহে গৃহে, প্রতি পল্লীতে পল্লীতে ক্ষুধার আগুন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে; পুড়িতেছে—পুড়িবে, মরিতেছে—মরিবে। সোনার বাঙ্গলা শ্মশান হইয়া যাইবে। কোটি কোটি বাঙ্গালী আজ ক্ষুধার তাড়নায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে,—ঊর্দ্ধে—নিম্নে—চারিদিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া তাকাইতেছে,—কে তাহাদিগকে এক মুষ্টি অন্ন দিবে? খাইতে না পাইলে যে মানুষ বাঁচে না! ইহারা কাহার দুয়ারে গিয়া হাত পাতিবে? রাজদ্বারে? শ্মশানে? কোথায় যাইবে?

অমাবস্যার নিশীথিনী,—অন্ধকারে স্তব্ধ,—এ শ্মশানে কে জাগে? একটা জাতি বহুদিন খাইতে না পাইয়া, যে জীর্ণ কঙ্কালসার অস্তিত্বের ভার বহন করিয়া আসিতেছিল, আজ আর

সে তাহাও পারে না। অস্থিচর্ম্মসার কোটি কোটি কঙ্কাল পড়িয়া পড়িয়া ধুঁকিতেছে, পতিপুত্রকে কোনরকমে আধপেটা খাওয়াইয়া ঘরে ঘরে বাঙ্গলার গৃহলক্ষ্মীরা সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া চক্ষের জল আঁচলে মুছিতেছে,—মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেছে না, কেহ দেখিতেছে না,—কেহ জানিতেছে না,—দিনে দিনে শুকাইয়া মরিতেছে। এ শ্মশানে কেহ জাগে? কেহ জাগে না? একটা জাতি ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিয়া যাইবে,—কেহ দেখিবে না? বলিবে অদৃষ্ট? কে গড়িয়াছে? কেহ কি ভাঙ্গিতে পারে না? বলিবে, তাহা ভাঙ্গিয়াই গিয়াছে। কেহ কি গড়িতে পারে না?

বহুদিন বাঙ্গলায় মানুষ জন্মে নাই। কিন্তু আর ত দেরী সহ্য হইবে না। এ যে যায় যায়। আকাশের উপর যদি ঈশ্বর থাক, বাঙ্গলা দেশকে একটা মানুষ ভিক্ষা দাও।

ইংরেজী কেতাবের অর্থ-বিজ্ঞানের সব ফর্‌মুলাগুলি নিঃশেষে পড়িয়াছি, কিন্তু বাঙ্গালী যে ভাতে মরিতেছে, এ সমস্যার উত্তর তাহাতে ত মিলে না। সত্যই—এ—অ—দৃষ্ট।

বলিবে—অজন্মা হয়, অনাবৃষ্টি হয়,—এর প্রতীকার কে করিবে? বলিবে,—জমির উৎপাদনের শক্তি কমিয়া গিয়াছে, জমিতে সার দেওয়া হয় না, কৃষক ভাল চাষ করিতে জানে না,—সে দোষ কাহার? বলিবে, বাঙ্গালী কৃষক অমিতব্যয়ী, কাজেই ধার করে, শোধ দিতে পারে না, সুদের দায়ে জমির শস্য উড়িয়া যায়। বলিবে, বাঙ্গালী কৃষক স্ত্রীর জন্য রূপার পৈছা তৈয়ার করে, মাটীতে টাকা পুতিয়া রাখে, কাজেই না খাইয়া

মরে। আরও যা যা বলিয়া আসিতেছ, এবং বলিতে চাও, তা সবি জানি। কিন্তু শুনিলে হয় ত বিশ্বাস করিবে না,—বোধ হয়, এ সকল কথার উপরেও কিছু বেশী জানি। বলি না কেন? বলিতে দেও না। আর এ ত শুধু কথা-কাটাকাটির ব্যাপার নয়। কথার মত কাজের ব্যবস্থা নাই, হইতে পারে না, হইতে দেও না। যাহা কাজের কথা—তাহার পশ্চাতে যদি কাজ না থাকে, তবে সে হয় শুধু কথার কথা। তাহা বলিয়া লাভ কি? বাঙ্গলায় নব্য স্তায় লইয়া যে বিতণ্ডা (Speculation) একদিন অনায়াসে চলিয়াছে, বাঙ্গলায় অর্থনৈতিক সমস্যা লইয়া আজ তাহা চলিতে পারে না। কেন না, অর্থ-বিজ্ঞান—তা সে বাঙ্গলারই হউক, আর আয়লণ্ডেরই হউক, শুধু বিতণ্ডা (Speculation) নহে।

আমরা, যাহারা দেশের দুঃখ ও দুর্গতি লইয়া বক্তৃতা করি, তাঁহাদের মুখে সম্প্রতি বাঙ্গলার এই অর্থনৈতিক সমস্যার কত কল্পনা, জল্পনা ও বিতণ্ডা শুনিয়া শুনিয়া হয়রান হইয়া পড়িয়াছি। শুনিয়াছি, মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা যৌথ-পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই এই দুর্দ্দশা ডাকিয়া আনিয়াছে,—শুনিয়াছি নাকি, জাতিভেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেই এই সমস্যার সমাধান হইবে,—শুনিয়াছি, পাশ্চাত্য Industrialism এর ভ্রান্ত আদর্শে বিভ্রান্ত না হইয়া কুটীর-শিল্পের পুনঃপ্রচলন করিতে হইবে, সহর ছাড়িয়া পল্লবাসী হইতে হইবে, নূতন ছাড়িয়া সনাতনে, ফিরিতে হইবে; ইত্যাদি।

কিন্তু যাহা ছিল, তাহা কেন গেল, কিসে গেল, সে কথার উত্তরে ইতিবৃত্ত মুখ লুকায় কেন? এত যে অন্নকষ্ট, তবু রাশি

রাশি অন্নের বিদেশে রপ্তানী কেন? যে টাকা জাতি একদিন ধার লইয়াছিল, এই মুখের গ্রাস তাহার সুদ যোগাইবার জন্য পাঠাইতে হইবে? উত্তম! কিন্তু কত দিন? যাবৎ না এই সমগ্র বাঙ্গালী জাতিটা———,কে জানে, কে বলিবে, ভবিষ্যতে কি লেখা আছে?

আজ একটা জাতির মুখের গ্রাস, কি পাপে জানি না, বিদেশে রপ্তানী হইয়া যাইতেছে। কিন্তু দেখিতেছি, জাতি ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির, মরণোন্মুখ। এই অন্নকষ্টে কে বলিতে পারে, জাতির স্বভাবধর্ম্ম শিথিল হইয়া পড়ে নাই? কে বলিতে পারে, একটা প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারিগণ ক্রমে পশুভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছে কি না? দেশের এ হেন অবস্থায়, সাহিত্যের কি ভবিষ্যৎ কল্পনা করা যায়? ধর্ম্ম যদি ধারণই করিতে না পারিল, তবে সে ধর্ম্ম কি? সমাজ যদি এই জাতীয় মৃত্যুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিল, তবে স্মৃতির আদেশ রঘুনন্দন দিলেও এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এত দিন এত দুঃখে তাহা মানিয়া চলিয়াও লাভ কি?

এ কি মৃত্যু? না হত্যা? না আত্মহত্যা?

আষাঢ়, ১৩২৬ সাল

দ্বিতীয় স্তবক

বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী

(১)

কথায় কথা উঠিয়াছে। আজ বিংশ শতাব্দীর লৌহ-কপাটে মাথা ঠুকিতে গিয়া, আমরা একবার আমাদের অতীত শতাব্দীর প্রতি ফিরিয়া দেখিয়াছিলাম। দেখিতে চাহিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালী আমরা দীর্ঘ একটি শতাব্দী ধরিয়া কি করিয়াছি, যার জন্য আজ আমাদের এমন দশা ঘটিল। শুনা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রত্যূষেই আমরা সচকিত হইয়াছিলাম; এবং "জাগিয়া উঠিয়া নবীন আলোকে—"সেই হইতেই ক্রমাগত সোপানের পর সোপান অতিক্রম করিয়া উন্নতির চরম সীমায় আসিয়া উপনীত হইতেছি। চরমে যে আসিয়া পৌঁছিয়াছি,—ইহা ত প্রত্যক্ষ। আর বেশী বাকী নাই। কিন্তু এ কিসের চরম?

তাই আমরা বাঙ্গালীর উনবিংশ শতাব্দীকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য একবার মুখ ফিরাইয়াছিলাম। আমাদের কেমন সন্দেহ হইয়াছিল, যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা যেন সব বিশ্বাস করিতে পারি নাই। যে আগুন একদিন জ্বলিয়া নিভিয়া গিয়াছে, সে আগুনে কি পুড়িয়া গিয়াছে,—রাশি রাশি ভস্মস্তূপের মধ্যে আমরা তাই খুঁজিবার জন্য ফিরিয়া গিয়াছিলাম;—এখনও খুঁজিতেছি।

বাঙ্গলার একটা রূপ ছিল, বাঙ্গলার একটা সুর ছিল;—বাঙ্গলার চিরন্তন প্রাণের যে সেই অপরূপ রূপ—আর সুর,—সমগ্র উনবিংশ

শতাব্দীতে তাহা কোথায়? এ কথা বলিলে তোমরা বুঝিতে পার না।—হয় ত আমরা বুঝাইয়া বলিতে পারি না। হয় ত বলিয়া এ কথা বুঝান যাইতে পারে না। হয় ত এ কথা বুঝিবার জন্য তোমরা চেষ্টাও কর না। অথবা কে জানে, হয় ত তোমরা ভাব, এ কথা বুঝিলে তোমাদের অপমান হইবে। যে কথা তোমরা ভাবিতে পার নাই,—সে কথা অন্যে ভাবিতে পারে,—ইহা অসহ্য, কাজেই অগ্রাহ্য। কে জানে, কেন তোমরা বুঝ না?

সূর্য্যের আলো দেখাইবার জন্য প্রদীপ জ্বালিতে হয় না। তথাপি সূর্য্যের উদয় ও অস্ত আছে। দুর্দ্দিনের দুর্য্যোগে মেঘাবরণ ভেদ করিয়া সে কিরণ ছড়াইতে পায় না। সূর্য্যকে ঢাকিবার জন্য মাঝে মাঝে মেঘ দেখা দেয়। তার পর রাত্রি। রাত্রিতে সূর্য্য কোথায় থাকে? অন্ধকারে সূর্য্য কোথায়? নিশাচর পক্ষীদের ডানা নাড়ার শব্দ, পেচকের ডাক, সেই ঘোর স্তব্ধতার মধ্যে দু' চারিটা শ্মশান-কুকুরের ঘেউ ঘেউ।

এমনি একটা অমানিশার অন্ধকার আজ বাঙ্গলা দেশকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। যে অন্ধকারে সূর্য্যের আলো ডুবিয়া যায়, এ অন্ধকার সে অন্ধকার নয়। এ অন্ধকারের বুঝি তুলনা নাই।

"মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং।
কণ্ঠাবসক্ত মুণ্ডালী-গলদ্রুধির-চর্চ্চিতাং॥"

বাঙ্গলা দেশের আজ এই মূর্ত্তি!

কলিকাতা সহর, বাঙ্গলা দেশ নয়। কলিকাতার বাহিরেও বাঙ্গলা দেশ আছে। কিন্তু বাঙ্গলার প্রকৃত জন-নায়কগণ,

"গণ-বিগ্রহের" পুরোহিতগণ সহরে নয়, পল্লীতে। ইহা আমরা জানি। সেই নিরন্নের দেশ, সেই ক্ষুধায় হাহাকারের দেশ, সেই শত রোগ, মহামারীর দেশ,—সেই ছিন্নবস্ত্রা অথবা বিবস্ত্রা নারীর দেশ, আজ কাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে? অসংখ্য জীবন্ত নর-কঙ্কাল,—বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে এক মহা মৃত্যুর করাল ছায়া বিস্তার করিতেছে। যিনি ধূম্রবর্ণ, দীর্ঘ দন্ত দ্বারা যাঁহার মুখ ভয়ঙ্কর,—সেই মহাকালের সহিত আজ এই অমানিশায় এ কার বিপরীত বিহার। এ সংহারের ক্ষেত্রে কে সৃষ্টির ক্রীড়ায় নিযুক্ত? সাধক নাই; একটা জাতির শবের উপর বসিয়া সাধন করিবে যে মহাভৈরব, বাঙ্গলা দেশে সে আজ কোথায়—?

বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রহরে, জীর্ণ প্রাসাদ কোটর হইতে পেচক ডাকিয়া উঠিয়াছে। আমরা সচকিত হইয়া সম্মুখে ও পশ্চাতে তাকাইতেছি। পশ্চাতে দীর্ঘ উনবিংশ শতাব্দী;—তাহার উৎসব-রজনীর সকল দীপগুলিই একে একে নিভিয়া গিয়াছে, নির্ব্বাপিত দীপশিখা হইতে কোথায়ও বা একটু ধূম নির্গত হইতেছে। আলো কোথায়? আলো নাই। বিংশ শতাব্দীর এই দুর্য্যোগের রাত্রিতে পথ চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে, সে আলো উনবিংশ শতাব্দীতে কোথায়,—কার হাতে?

সম্মুখে আঁধার, পশ্চাতে—নির্ব্বাপিত দীপ,—বাঙ্গালী ছত্রভঙ্গ, বিপথগামী। তোমরা বাঙ্গলার উনবিংশ শতাব্দীর 'গলায়' এই বিংশ শতাব্দীর হাড়ের মালা পরাইয়া দাও;—দেখি অন্ধকারে কেমন দেখায়!

কবি বলিয়াছেন,—

"স্বরূপ বিহনে রূপের জনম
কখনো নাহিক হয়।"

বাঙ্গলার প্রাণের স্বরূপ কি? বাঙ্গলার প্রাণের এই স্বরূপকে যে না চিনিয়াছে, সে কি করিয়া রূপের জন্ম দিতে পারিবে? সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে তাই কোন রূপের সৃষ্টি হয় নাই,—কোন সুরের দোল উঠে নাই।

শুনিতে পাই—সমগ্র পাঠান ও মোগল যুগে, বাঙ্গালী শুধু তাহার স্মৃতি ও ন্যায়ের ব্যর্থ অনুশীলনে, "মস্তিষ্কের অপব্যবহার" করিয়াছে। মুসলমান যুগে বাঙ্গালী তাহার সমাজ-রক্ষার জন্য যে সকল বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছে, তাহার সহিত তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে। যে দর্শন আলোচনা বাঙ্গালী করিয়াছে—বুনো রামনাথ পর্য্যন্ত যাহার রেশ দেখা গিয়াছে, তাহা বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার হইলেও, পৃথিবীর অনেক মেধাবী জাতিসকলের যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিবার বিষয়।

মুসলমান যুগে—শাক্ত ও বৈষ্ণবের সাধন ধর্ম্মের যে বিচিত্র ইতিহাস বাঙ্গালী রাখিয়া গিয়াছে,—উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মসংস্কারকে তাহার সহিত তুলনা করিতে সাহসী হইবে, এত বড় দুঃসাহসী কেহ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। মুসলমান যুগে বাঙ্গলা সাহিত্য বাঙ্গালীর প্রাণের যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা কাব্যের রূপান্তরে ফুটাইয়া তুলিয়াছে—কলকলার ইতিহাসে তাহা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলা সাহিত্যের নিকট নিশ্চিতই হীনপ্রভ হইবে না। যে সমস্ত বড় বড় বাঙ্গালী মুসলমান যুগে জন্মিয়াছে—উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁহাদের বংশে বাতি দিতে একটিকেও দেখিলাম না।

মুসলমান যুগ, বাঙ্গলার ইতিহাসে একটা সঙ্কটযুগ। এই যুগে বাঙ্গালী নানাদিক হইতে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং আত্মরক্ষা, যে কোন প্রকারেই হউক, বাঙ্গালী করিয়াছে।

আর ব্রিটিশ যুগে? বাঙ্গালী তাহার সাহিত্য, ধর্ম্ম ও সভ্যতার পুনর্গঠনে গত এক শত বৎসর ধরিয়া কতটা আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে,—মুসলমানযুগের তুলনায়, তাহার বিচার মাত্র আরম্ভ হইয়াছে,—শেষ হয় নাই।

বাঙ্গালী উনবিংশ শতাব্দীতে যতটা ইংলণ্ডের অনুকরণ করিয়াছে,—করিতে গিয়াছে, গিয়া ব্যর্থ হইয়াছে; পৃথিবীতে একটা সভ্যজাতি কদাচিৎ অপর একটা সভ্যজাতিকে এমন নকল করিতে গিয়া নাকাল হইয়াছে।

বাঙ্গলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে,—তাহাতে বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের স্থান কোথায়? বাঙ্গালী একশত বৎসর ধরিয়া ভাবিয়াছে যে, তাহার জাতীয় সাহিত্যে শিক্ষণীয় এমন কিছুই নাই—যাহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা আবশ্যক। জাতীয় সাহিত্যের প্রতি এত বড় বিদ্রোহ করিয়া, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণ করিয়া, যে সাহিত্য বাঙ্গালী উনবিংশ শতাব্দীতে রচনা করিয়াছে, কে জানে তাহা মুসলমান যুগের স্মৃতি ও ন্যায় চর্চ্চা অপেক্ষাও বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অধিকতর অপব্যবহার কি, না?

বাঙ্গলার উনবিংশ শতাব্দী,—বাঙ্গালীর নহে। কিন্তু বাঙ্গালীর অষ্টাদশ শতাব্দী বাঙ্গালীর। অথচ বাঙ্গালীর অষ্টাদশ শতাব্দী একটা পতনের যুগ আর বাঙ্গলার উনবিংশ শতাব্দী একটা উত্থানের যুগ,

বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। জাতীয় ভাব ও সভ্যতার প্রতি বিদ্রোহ করিয়া, পরের নকল করিয়া, যে একটা জাতির অভ্যুদয় হইতে পারে না, বাঙ্গলার উনবিংশ শতাব্দীই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই দেখিতে পাই অষ্টাদশ শতাব্দীর পতনের যুগেও বাঙ্গলা যতটা আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল,—উনবিংশ শতাব্দীর উত্থানের যুগে তাহা পারে নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর অনভিজ্ঞ স্তাবকগণ একবার বিবেচনা করেন না, যে ইতিপূর্ব্বে কোন্ যুগে বাঙ্গালী তাহার জাতীয় সাধনপদ্ধতিকে এমন ভাবে পরিত্যাগ করিয়াছে! কোন্ যুগে দর্শন আলোচনায় বাঙ্গালী এমন অন্তঃসারশূন্যতার পরিচয় দিয়াছে, সমাজের বিধিব্যবস্থা প্রণয়নে ও তাহার প্রচলনে এতদূর অক্ষমতা দেখাইয়াছে? বাঙ্গালী-প্রধানেরা কোন্ যুগে এমন ভাবে বাঙ্গালী-সমাজের উপর প্রভুত্ব হারাইয়া ইতঃভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট হইয়াছে? আজ এই গণতন্ত্রের যুগে বাঙ্গলার গণ-বিগ্রহের পুরোহিত কে?

বাঙ্গালী তাহার ইষ্ট দেবদেবীর রূপ ধ্যান ছাড়িয়াছে, নাম জপ ছাড়িয়াছে,—পতঙ্গের মত,—"যে বিদ্যুৎ ছটা রমে আঁখি, মরে নর তাহার পরশে"—সেই আলেয়ার পশ্চাতে ইউরোপের অলিতে গলিতে ঘুরিয়াছে,—আর শতাব্দীর দীর্ঘ ভ্রমণ শেষ করিয়া কি সুখের মরণ বেসাতি করিয়া আজ গৃহে ফিরিয়াছে।

রামমোহনের কথা অনেকে তুলিয়া থাকেন। আমরা কোন দিনই রাজা রামমোহনের অতুলনীয় প্রতিভার অবমাননা করিতে প্রয়াস পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী বৈষ্ণবের পরম পুরুষ শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যাহার বিচারে স্থির হইয়াছে যে, 'অগম্যাগমন'

করিয়াছেন; আর সেই সঙ্গে যিনি বলিয়াছেন যে, খৃষ্টান-ধর্ম্মনীতি, হিন্দু-ধর্ম্মনীতি অপেক্ষা এত উৎকৃষ্ট যে জাতীয় অভ্যুত্থানের পক্ষে খৃষ্টান-নীতিমার্গের পথিক না হইলে, আমাদের আর উপায় নাই; তিনি যে আমাদের জাতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে একেবারে শেষ কথাটি বলিয়া গিয়াছেন, ইহা আমরা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতে কিঞ্চিৎ আপত্তি প্রকাশ করিবই এবং তজ্জন্য আমরা যথোচিত "মনস্তাপবিশিষ্ট।"

যে পথের পথিক হইলে বাঙ্গালীর সাধনায় মহাজন হয়,—যে ভাবের ভাবুক হইলে "যাহা যাহা দৃষ্টি যায়, তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে,—আর 'স্বাদিতে নিজ মাধুরী মনে উঠে কাম'—সেই রস ও সেই *ভাবের সাধনায় যদি, যে কোন উত্তম কারণের জন্যই হউক,* রামমোহন না গিয়া থাকেন, তবে বলিতে হয় বৈকি যে বাঙ্গলার প্রাণের সহিত রামমোহনের যথেষ্ট পরিচয় থাকা সত্বেও ষোলকলা পূর্ণ হয় নাই।

বাঙ্গালী তাহার উনবিংশ শতাব্দীতে বিগ্রহের শ্রীঅঙ্গে অগ্নি-সংযোগ করিয়াছে, আজ সে আগুন সমস্ত বাঙ্গলাকে পুড়াইয়া ফেলিবার জন্য লেলিহান রসনা বিস্তার করিয়াছে। অপৌরুষেয় যে বেদবাণী, বাঙ্গালী তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে, আজ বিশ্বে বাঙ্গালীর কথায় কেহ কর্ণপাতও করে না, ভ্রূক্ষেপও করে না। বিগ্রহের শ্রীমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া, শাস্ত্র জ্বালাইয়া, বাঙ্গালী বিধবার ব্রহ্মচর্য্যে ক্রমে আস্থাহীন ও অক্ষম হইয়া উঠিয়াছে,—উনবিংশ শতাব্দী সে কথাও বলে। বাঙ্গলার প্রত্যেক জাতিকে দ্বিজোচিত সংস্কারে বলীয়ান করিয়া, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্যকে অনুসরণ করিয়া,

স্মৃতির নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া বিবাহ বিধির সংস্কারে বাঙ্গালীর যে অক্ষমতা উনবিংশ শতাব্দীতে তাহাও দেখিয়াছি। বাঙ্গালী তাহার বিবাহপদ্ধতির সংস্কার করিতে গিয়া, এই উনবিংশ শতাব্দীতেই কবুল জবাব দিতে বাধ্য হইয়াছে যে, সে বাঙ্গালী ত নহেই, "হিন্দুও নহে।" উনবিংশ শতাব্দীর যে চারিটি সংস্কারের কথা উল্লেখ করিলাম, ইহার অতিরিক্ত ১৮১৪ খ্রীঃ হইতে ১৮৭২ খৃঃ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর আর কোন নূতন সংস্কার নাই। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকারী এই চারিখানি সংস্কার, যাহা মূলে ও শাখায়, বিদেশীর অনুকরণপ্রসূত তাহা লইয়া উনবিংশ শতাব্দীর বড়াই যাহারা করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে স্বামী বিবেকানন্দের একটি কথা অতি দুঃখের সহিত স্মরণ করাইয়া দিতে বাধ্য হইতেছি, "আহাম্মকের কথা মানুষেই শুনে না, তা ভগবান।"

বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দীকে আমরা মুছিয়া ফেলিতে পারিব না, চাহিও না। আমরা বাঙ্গলার ইতিহাসে বাঙ্গালীর উনবিংশ শতাব্দীর একটা যথাযথ স্থান নির্দ্দেশ করিতে চাই। চাটুকারের অযথা চাটুবাদ, আর নিন্দুকের অযথা নিন্দা,—এই উভয় সঙ্কটের মধ্য দিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।

বাঙ্গলার সমাজের বিভিন্ন স্তরে একটা উৎকণ্ঠা দেখা দিয়াছে। এই সমস্যা ক্রমে ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিবে। কে জানে ইহার ভবিষ্যৎ কোথায়? যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই প্রতিষ্ঠা করিতে চাও, তবে বাঙ্গালীসমাজের বিলুপ্ত বর্ণসকলকে আগে উদ্ধার কর। কলিতে কেবল আদি ও অন্ত বর্ণ আছে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য নাই—একথা অতি বড় মহামহোপাধ্যায় বলিলেও আর

চলিবে না। লুপ্ত বর্ণ সকলকে উদ্ধার করিয়া, আবার তাহাদিগকে চারিটি আশ্রমের সহিত সংযুক্ত করিয়া দাও। স্মৃতির নব কলেবর কর। তাহা না করিয়া, বাঙ্গলার বিরাট জনসংঘকে, জল অনাচরণীয় বলিয়া, দূরে তাড়াইয়া বেহারী জমিদারকে ভাড়া করিয়া মেঠো বক্তৃতায় বাঙ্গলার বিংশ শতাব্দীর সামাজিক সমস্যার মীমাংসায় যাঁহারা অগ্রসর, তাঁহারা ভবিষ্যের কুলপ্লাবী প্রলয়বন্যার বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করিয়া কেবল স্বার্থ, বিদ্বেষ ও অক্ষমতারই পরিচয় দিবেন, প্লাবনের বেগ তাঁহারা রোধ করিতে পারিবেন না।

সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে আজ আমরা বাঙ্গলাদেশে এই "গণ-বিগ্রহে"র নব জাগরণ নিরীক্ষণ করিতেছি। আজ যাহা উদ্‌বুদ্ধ কে জানে কাল তাহা ক্ষিপ্ত হইবে না? আর কে জানে 'নারায়ণ' বাঙ্গলা দেশে কোন্ পথ দিয়া কিরূপে আবির্ভূত হইবেন? শতাব্দীর আলোচনায় ইহাই আমাদের চিন্তা—আর কিছুই নাই।

বৈশাখ, ১৩২৬ সাল

বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী

(২)

বাঙ্গালীর ইতিহাস আছে। কিন্তু তাহা কেহ লেখে নাই। বাঙ্গালীও একটা জাতির মত জাতিই ছিল, কিন্তু সে কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। বাঙ্গালীর ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দী নহে। বাঙ্গলার প্রথম পুরুষ রাজা রামমোহন নহেন। বাঙ্গালীর ধর্ম্মান্দোলন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আন্দোলন নহে। *খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মান্দোলনের সহিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের* আন্দোলন এবং প্রটেষ্টাণ্ট আন্দোলনের কারণগুলির সহিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মান্দোলনের কারণগুলির তুলনা করিয়া যাঁহারা বিচার করেন এবং এই উভয় আন্দোলনের মধ্যে কায়ক্লেশে একটা সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া মনে মনে এক অনির্ব্বচনীয় গৌরব অনুভব করেন, তাঁহারা ইংরেজের স্কুলের ছাত্র, কিন্তু বাঙ্গালী নহেন।

প্রত্যেক বিশেষ জাতির ইতিহাস তাহার বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই লেখা উচিত। সকল জাতির ইতিহাস একই বস্তু অবলম্বন করিয়া রচিত হইতে পারে না। কেননা সকল জাতির বৈশিষ্ট্য একই বস্তুর উপর নির্ভর করে না। ইংরেজের ইতিহাস যে উপাদানে রচিত, বাঙ্গালীর ইতিহাস সে উপাদানে রচিত হইতে পারে না। অথচ দু'একখানা খ্যাতনামা বাঙ্গলার ইতিহাসও এই ভ্রান্ত পদ্ধতি অবলম্বনে রচিত হইয়া অনেক মহামূল্য নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক উপাদানকে ব্যর্থ করিয়াছে মাত্র।

বাঙ্গলার ইতিহাসে বাঙ্গলার ধর্ম্ম নাই, সমাজ নাই, ক্রম-বিকাশের পথে তাহাদের পারম্পর্য্য নাই, কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-বিচার নাই, আছে প্রাচীন দু'চারিটী মুদ্রার সন তারিখ লইয়া শুষ্ক বাদানুবাদ। ইহারও সার্থকতা আছে। কিন্তু ইহাই বাঙ্গলার ইতিহাস নহে। ব্রাহ্ম-আন্দোলন যদি বাঙ্গালীর হয়, তবে ইতিহাসের পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া ইহাকে বাঙ্গলার ইতিহাসের আগেকার ধর্ম্ম ও সমাজবিপ্লবের সহিত তুল মূল করিয়া দেখিতে হইবে। যদি প্রাচীন আন্দোলনগুলির সহিত ইহার কার্য্যকারণ সম্পর্ক না থাকে, যদি বাঙ্গলার ইতিহাসে ইহার পারম্পর্য্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, ইহার বীজ যদি বাঙ্গালীর স্বভাবধর্ম্মে না থাকে তবে বাঙ্গলার ইতিহাসে ইহার দাবী কিসের? বাঙ্গলার অনেক শতাব্দীরই ইতিহাস নাই। উনবিংশ শতাব্দীরও না হয় নাই থাকিল?

কথা উঠিয়াছে, বাঙ্গলার ইতিহাস এবং তাহাতে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য। সুতরাং দেখিতে হইবে, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য কি, এবং তাহার ইতিহাস কোথায়? আর দেখিতে হইবে সেই বৈশিষ্ট্যের সহিত উনবিংশ শতাব্দীর আন্দোলনের কোন যোগ আছে কি না? শ্রদ্ধেয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় সমালোচনা-সাহিত্যে একটা পাহাড়-পর্ব্বত বলিলে অত্যুক্ত হয় না। তাঁহার 'পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের শেষভাগে তিনি বলিয়াছেন—

"কপিলদেব প্রিয়া, ন্যায়শাস্ত্র-প্রসূতি, তন্ত্র-শাস্ত্র-জননী বঙ্গমাতা কতকাল আত্ম-বিস্মৃতা হইয়া নীচানুকরণরতা থাকিবেন?"

অবশ্য তাহা আমরা বলিতে পারি না,—কতদিন থাকিবেন।

কিন্তু ভূদেব ব্রাহ্মণের এই উক্তির মধ্যে ন্যায়শাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রকে বাঙ্গালী-সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি ; এবং ইহার সহিত বাঙ্গালীর স্মৃতিশাস্ত্র ও বৈষ্ণবধর্ম্মকেও সংযুক্ত করিয়া দিতে পারি। এই চারিটি বাঙ্গলার প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া স্বীকার করিতে কেহই আপত্তি করিবেন না। ইহার সহিত বাঙ্গালীর সাহিত্যকেও স্থান দিতে হইবে।

যে স্মৃতির উপর ভিত্তি করিয়া ভারতের সমগ্র হিন্দু-জাতি *আপনাদের পারিবারিক* ও *গার্হস্থ্য জীবন* এবং এক অত্যাশ্চর্য্য সমাজ-বিন্যাস রচনা করিয়াছে, বাঙ্গালী হিন্দু তাহাকে স্বীয় প্রতিভা ও অবস্থানুযায়ী অশেষ রূপ পরিবর্ত্তিত ও অনেক স্থলে সংশোধিত করিয়া লইয়াছে। জীমূতবাহন হইতে রঘুনন্দন তাহার শেষ সাক্ষী। বাঙ্গালী জৈমিনির পূর্ব্ব-মীমাংসাও গ্রহণ করে নাই, গৌতমের ন্যায়কেও ডাকিয়া আনে নাই, তাহার স্মৃতির অনুযায়ী দর্শন সে নিজেই উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছে। নব্যন্যায়ে বাঙ্গালীই গুরু, সমগ্র হিন্দু ভারতবর্ষ তাহার শিষ্য। এই নব্যন্যায় ও দায়ভাগ স্মৃতিতত্ত্বে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যও আছে। এই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই বাঙ্গালী মুসলমানের অধীনে থাকিয়াও, ধর্ম্মে ও সমাজে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। কি আশ্চর্য্য উপায়ে যে বাঙ্গালী এক হাজার বৎসর আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে, আর কি আশ্চর্য্য রকমে আজ আমরা তাহা ভুলিয়া গেলাম !

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বাঙ্গালী এইরূপে স্থিতি ও গতির অবসর রাখিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে জগতে একটা বৈশিষ্ট্যের

দাবী রাখিয়াছে। কে এই প্রতিভার পরিমান করিবে? কে ইহার ইতিহাস লিখিবে?

তারপর বাঙ্গলায় শাক্ত আছে, বাঙ্গলায় বৈষ্ণব আছে। ইহার ইতিহাস আছে, সাহিত্য আছে, দর্শন আছে, সাধন-পদ্ধতি আছে, সম্প্রদায় আছে, দেবদেবী আছে, ইহারাও বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর কোন সভ্যজাতি এই দুই সম্প্রদায়ের জন্য গৌরব অনুভব করিবে না?

বাঙ্গালী বৌদ্ধ হইয়াছিল, জৈনমতও বাঙ্গলায় প্রবেশ করিয়াছিল। বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য-মতবাদ পরবর্ত্তীকালের শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে কি পলি রাখিয়া গেল, কে আলোচনা করিয়াছে? কেন কাশ্মীরের তন্ত্রে আর বাঙ্গালীর তন্ত্রে পার্থক্য? কেন বৈদিক ধর্ম্মে দেবপূজা আর বাঙ্গালীর তান্ত্রিক ধর্ম্মে দেবীপূজা? কেন উত্তর ভারতে শিব, আর বাঙ্গলায় কালী? কেন বৈদিক প্রণালীতে যাগযজ্ঞ, কেন তান্ত্রিক-প্রণালীতে জপ ও সাধন-মাহাত্ম্য? কেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবে আর দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবে পার্থক্য? কেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবে এত মধুর ভাব, যুগল ভাবের প্রাবল্য, আর কেনই বা বাঙ্গালীর তন্ত্রে মাতৃভাবের প্রাধান্য? তাইতো ভাবি বাঙ্গলার এত বৈশিষ্ট্য, এত স্বাতন্ত্র্য, এত বৈচিত্র্য, এত গৌরব আর অথচ আজ এত লজ্জা?

কোন একটা বড় ধর্ম্মের উৎপত্তি সম্যক্‌রূপে নিরূপণ করা আধুনিক ধর্ম্ম-বিজ্ঞানেরও সাধ্যাতীত। এই যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম একদিন শ্যামলা বঙ্গভূমির বক্ষে যে স্রোত বহাইয়াছিল, যে বন্যা ছুটাইয়াছিল, যে সমাজ-বিপ্লব, যে রাষ্ট্র-বিপ্লবের হস্ত

হইতে বাঙ্গলাকে অন্ততঃ তিনটী দীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া রক্ষা করিয়াছিল, ইতিহাসের পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর এত বড় রাজা রামমোহনের প্রতিভাও কি তাহা সম্যক ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছে ? যে বাঙ্গলায় একদিন মহাপ্রভুর ধর্ম্ম সম্ভব হইয়াছিল, সে বাঙ্গলাও স্বাধীন ছিল না, মুসলমানের অধীন ছিল। কিন্তু বৈষ্ণব-বেদান্তে যে তত্ত্বের আভাষ বাঙ্গালী পাইল, বৈষ্ণব প্রেম-ধর্ম্মে যে ভাবের স্বাধীনতা বাঙ্গালীকে সমস্ত ক্ষুদ্রতার বন্ধন হইতে উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিল, যে স্বাধীনতার আবেগে বাঙ্গালী বাঙ্গলার বেড়া ডিঙ্গাইয়া সমগ্র ভু-ভারতকে ধর্ম্মে স্বাধীন করিবার জন্য ছুটিল, পৃথিবী আজিও সে ধর্ম্ম-বিপ্লবের ইতিহাস শুনে নাই। তৃণ হইতেও নীচ হইয়া, তরু হইতেও সহিষ্ণু হইয়া, অমানীকে মান দিয়া, হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে বাঙ্গালীর এই প্রেমধর্ম্ম সম্রাটের তরবারীর সম্মুখে, মাতালের কলসীর কানার আঘাতে দরদবগলিত রক্তাক্ত দেহে সত্যাগ্রহের ধর্ম্মাগ্রহের যে প্রচণ্ড বিক্রম দেখাইয়াছিল, আজ তাহা বাঙ্গলায় রূপকথার কাহিনী হইয়াছে। বৌদ্ধ-বিপ্লবের পরে এত বড় ধর্ম্ম-বিপ্লব ভারতবর্ষের ইতিহাস দেখাইতে পারে না। সেই বিপ্লব উত্থিত হইয়াছিল বাঙ্গলা হইতে, বাঙ্গলার তীর্থ—নবদ্বীপ হইতে, সেদিন বাঙ্গালী কাশী জয় করিয়াছিল, সেদিন বাঙ্গালী দাক্ষিণাত্য জয় করিয়াছিল, সে দিন বাঙ্গালী উৎকলে গুরুর আসন গ্রহণ করিয়াছিল। আজ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত বা উন্মত্ত আমরা, শিক্ষিত আমরা, বাঙ্গালীর সেই দিগ্বিজয়ী ধর্ম্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস করিলেও পারি, না করিলেও পারি।

উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন, বাঙ্গলার এই ইতিহাসে, এই বৈচিত্র্যে কি সূত্রে, কি কার্য্যকারণসম্পর্কে সংযুক্ত হইতে চাহেন? এই তত্ত্ব যিনি উদ্ঘাটন করিয়া না দেখাইতে পারিবেন এবং না দেখাইতে পারিয়াছেন, বাঙ্গলার উনবিংশ শতাব্দীকে বাঙ্গলার চিরন্তন প্রাণের এক স্বাভাবিক বিকাশ বলিয়া অথবা গৌরব করিবার তাঁহার পক্ষে কোন হেতু নাই।

আমরা দেখিতে পাই, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে রাজা রামমোহনের ধর্ম্ম-সংস্কারে বাঙ্গালার দর্শন স্মৃতি এবং বিশেষ বিশেষ সাধক সম্প্রদায়ের বিষয় উল্লেখ আছে। অনেকের বিশ্বাস বাঙ্গালীর দর্শন-স্মৃতি এবং সেই সঙ্গে শাক্ত ও বৈষ্ণবের সম্প্রদায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হইয়া ধ্বংসের মুখে পড়িয়াছিল, ইহার সকলকেই রাজা রামমোহন এক অখণ্ড ঐক্যমূলক ভিত্তির উপর আহরণ করিয়া আনিবার চেষ্টায় ছিলেন, এবং এই জন্যই তাঁহাকে শাঙ্কর বেদান্তের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। এই গণতন্ত্রের ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে তিনি রঘুনন্দনের পরে স্মৃতিকে কোন কোন দিকে সংশোধন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। শাক্ত ও বৈষ্ণব, সাধনে ও মতে পরস্পর বিরোধী হইয়া যখন বিনষ্ট হইতেছিল, তখন তিনি অদ্বৈত-বেদান্তের ভূমিতে তাঁহাদের উভয়কে তুলিয়া ধরিয়া তাঁহাদের বিরোধ ভঞ্জনের চেষ্টায় ছিলেন, এইরূপে অনেকাংশে বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্যগুলিকে তিনি নাকি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বিধিমত রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

রামমোহন-পন্থীর এই প্রকার সমালোচনার প্রশংসা আমরা করি, কিন্তু তথাপি ইহাকে সমস্ত দিক হইতে স্বীকার করিতে পারি না।

রামমোহনে নব্য-ন্যায়ের আলোচনা কোথায়? এবং সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বা তাহা কোথায়? ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনাথে যাহার প্রস্ফুরণ, তাহা হরিদাস, রামভদ্র, মথুরানাথ, ভবানন্দ, হরিরামের মধ্য দিয়া সমগ্র শতাব্দী ভরিয়া প্রবাহিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে এই স্রোতধারাই জগদীশে মথিত ও উদ্বেলিত হইয়া গদাধর, জয়রাম, বিশ্বনাথের মধ্য দিয়া সমগ্র শতাব্দীকে আলোকিত করিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে রামনারায়ণ, হরিরাম, শঙ্কর, শিবনাথ কাশীনাথ, শ্রীরাম, হরমোহন এমন কি বুনো রামনাথ পর্য্যন্ত শতাব্দীকে বাঙ্গালীর ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে দেয় নাই।

হরের গদা, গদার জয়,
জয়ার বিশু লোকে কয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর 'লোকে'—এইরূপ হরিরাম, গদাধর, জয়রাম, বিশ্বনাথের কি পারম্পর্য্য কহিয়াছেন? ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর দর্শন অন্ধ তমসায় কোন্ অতলে ডুবিয়া গিয়াছে! শিরোমণি, সার্ব্বভৌম, তর্কবাগীশ, সিদ্ধান্তবাগীশ, তর্কালঙ্কার, ন্যায়ালঙ্কার, ন্যায়বাগীশ, ন্যায়পঞ্চানন, ন্যায়বাচস্পতি তর্কপঞ্চানন, তর্কসিদ্ধান্ত, এই সমস্ত উপাধি ১৬শ হইতে তিন শতাব্দী বাঙ্গালীকে আলোক বিতরণ করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সে আলোক নিভিল কেন—? কোথায় গেল সে ব্রাহ্মণ, সে পাণ্ডিত্য, সে তেজ বীর্য্য দম্ভ,—বাঙ্গালীর সেই অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য?

তারপর স্মৃতি। জীমূতবাহনের ব্যবহার ও রঘুনন্দনের আচার উনবিংশ শতাব্দীতে নাই। রাজা রামমোহন পৈতৃক সম্পত্তির উপর পিতার অধিকার বিশ্লেষণে, কে বলিবে—দায়ভাগের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন কিনা? আমরা তো দেখিয়াছি যে, এক উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রভাবে চালিত হইয়া তিনি এই সম্পর্কে দায়ভাগের বিপরীত সিদ্ধান্তে গিয়া উপনীত হইয়াছেন, অথচ দুঃখের বিষয় তাঁহার ভ্রান্ত সিদ্ধান্তকেই দায়ভাগের সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। অবশ্য স্ত্রীজাতির স্বত্বাধিকার নির্ণয়ে তিনি অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই ব্যবহারিক জগতের স্বত্বাদির সহিত তাঁহার—মায়াবাদ ও নির্গুণ ব্রহ্মের সামঞ্জস্য কে খুঁজিয়া দিবে?

বৈষ্ণব বেদান্ত বলিয়া যে একটা বেদান্ত ছিল, "অচিন্ত্যভেদা-ভেদবাদ" বলিয়া যে বাঙ্গালীর একটা দার্শনিক মতবাদ ছিল, শ্রীমদ্ভাগবৎ, অক্ষরে অক্ষরে উপনিষদের অনুরূপ না হইলেও ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি এবং ইহার সিদ্ধান্তগুলি যে বহুস্থলেই অনেক সগুণাত্মক শ্রুতির অনুরূপ এবং ইহার দার্শনিক ভিত্তিও যে বেদান্তের একটী শাখার সহিত অণুস্যূত, তাহা রাজা রামমোহন বিবেচনা করিলেন কোথায়? জীব ও বলদেব বিদ্যাভূষণ সম্বন্ধে তাঁহার কোন মন্তব্যই তো আমরা পাই না। তাঁহারা কি বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য ছিলেন না, শঙ্করের প্রতিধ্বনি কি বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য? অবশ্য তন্ত্রের ঝোঁক অনেকটা শাঙ্কর-অদ্বৈতের দিকে। সে জন্যই হউক, অথবা আর যে জন্যই হউক, বাঙ্গালীর তন্ত্রের অদ্বৈতের দিকটা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তন্ত্রের যে

মাতৃভাবের বৈশিষ্ট্য তাহা রামমোহনে কোথায়? বৈষ্ণবের 'কান্তভাব'—অশ্লীল বলিয়া তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তন্ত্রোক্ত চক্রের সাধনায় শক্তিগ্রহণ অথবা শৈব বিবাহ তিনি যথাশাস্ত্র সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহার কি কারণ ছিল, নির্ণয় করা কঠিন

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের কোন একটাও কোন একদিক হইতে নূতন বল লাভ করে নাই। কোন নূতন শক্তি লাভ করিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় নাই। বেদ শুধু বেদান্ত নহে—বেদ শুধু জ্ঞানকাণ্ড নয়, কর্ম্মকাণ্ডও বটে; বেদের এই কর্ম্মকাণ্ডের দিক্‌টা উনবিংশ শতাব্দী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছে। এই কর্ম্মকাণ্ডের কোন উল্লেখ বা সংস্কার ও সংশোধন, উনবিংশ শতাব্দীতে নাই। সমগ্র বাঙ্গালী হিন্দু, তন্ত্রের দীক্ষা ও উপাসনার দ্বারা পরিচালিত, এই তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডে যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ অবস্থার নিদর্শন পাওয়া যায়, তেমনি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডেরও প্রতিধ্বনি ইহাতে শুনা যায়। বাঙ্গালী হিন্দুর সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান তান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তন্ত্রের মধ্য দিয়াই বৈদিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, উনবিংশ শতাব্দী কর্ম্মকাণ্ডকে যথাশাস্ত্র আলোচনা করিবার স্পর্দ্ধাই করেন নাই, সংস্কার সংশোধন তো দূরের কথা! বৈদিক ভিত্তির উপর যাহা প্রতিষ্ঠিত, শুধু খ্রীষ্টানী বক্তৃতার ঝড়ে তাহার কি করিবে? উনবিংশ শতাব্দী কিছুই করিতে পারে নাই।

উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা অনেক শ্রুতিবাক্যের প্রতিধ্বনিও শুনিয়াছি। কিন্তু উপনিষদের বাক্যগুলি আনকোরা আগন্তুকের

মত বাঙ্গালীর ধর্ম্মসাধনায় কোনদিনই স্থান পায় নাই ; কেননা—বাঙ্গালীকে ইতিহাস গড়িয়া চলিতে হইয়াছে, বাঙ্গালীকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য পথ উদ্ভাবন করিয়া চলিতে হইয়াছে। বাঙ্গালীর বেদান্ত আছে, তাহা শঙ্করও নয়, রামানুজও নয়—তাহা শাক্ত বা শৈব বেদান্ত, তাহা বৈষ্ণব-বেদান্ত। বেদান্তের প্রধাণতঃ দুই শাখা, এই দুই শাখাই বাঙ্গলায় আছে। উপশাখাও আছে, কিন্তু যাহা আছে তাহা কোন কিছুর প্রতিধ্বনি নয়, তাহা বাঙ্গালীর সৃষ্টি। তাহা বাঙ্গালীর প্রতিভা হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মান্দোলন শাক্ত ও বৈষ্ণব বেদান্তের ভূমিতে অতি অল্পই ভ্রমণ করিয়াছে। বেদান্তের বিশাল দুইটী ধারায় বাঙ্গালী যে তাহার প্রতিভার, তাহার বৈশিষ্ট্যের ছাপ দিতে সমর্থ হইয়াছিল, বাঙ্গলার স্বভাব-ধর্ম্মের অনুযায়ী তাহাকে যে নব-বৈচিত্র্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারযুগের কোন নেতাই বাঙ্গলার বেদান্তের সেই দুই শাখাকে পল্লবিত বা মুকুলিত করিতে পারেন নাই, কেহ বা শঙ্করের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, আবার কেহ বা সেই প্রতিধ্বনির প্রতিবাদ করিয়াছেন, এবং তাহাও কার্ত্তেজীয়ান দর্শনের সাহায্য লইয়া—কেহ বা উপনিষদের নির্গুন ব্রহ্মের উপাসনা চালাইয়াছেন। কেহ বা তাহার প্রতিবাদ করিয়া সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা চালাইতে চাহিয়াছেন—পাশ্চাত্য দর্শনের সূত্রে অসম্বদ্ধ ভাবে উপনিষদ বাক্যকে গ্রথিত করিয়া।

ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির পথে, বাঙ্গালীর বিশিষ্ট প্রচলিত ধর্ম্মচিন্তা ও সাধন-পদ্ধতিকে, বাঙ্গালীর 'আচার' ও 'ব্যবহার'কে, কেহই পরিচালিত করিতে পারেন নাই। তান্ত্রিক অদ্বৈতবাদ-

সূচক উপাসনাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া, কেহবা ফেনেলোঁর স্তোত্র দিয়া তাহাকে সরস ও সগুণ করিয়াছেন। অমৃতসরের গুরু-দরবারের নিকট হইতেও কেহবা কিছু আহরণ করিয়াছেন। সেই 'গগনমে থাল রবি-চন্দ্র-দীপক বনে' আসিয়াছেন, পারস্ত হইতে হাফেজ পর্য্যন্ত আসিয়াছেন—হাফেজের গোলাপ, সাকী, সিরাজী সকলেই আসিয়াছেন। কিন্তু—সেই—

—"থির বিজরী, বরণ গোরী,
চলে নীল সাড়ী, নিঙারি নিঙারি,
পরাণ সহিত মোর—"

আসিতে পারেন নাই। আর আসিতে পারেন নাই, সেই—

—"গলিত চিকুর ঘটা, নবজলধর ছটা
ঝাপল দশদিশি তিমিরে।"

কেননা, ইহারা যে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীর। ইহারা যে এই মাটীর সহিত রসে-রক্তে পরিপুষ্ট হইয়া বাঙ্গালীর হৃদিশতদল হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই বড় দুঃখেই বলিতে ইচ্ছা হয়—

—"মন হারালি কাজের গোড়া
তুই কাচ মূলে কাঞ্চন বিকালি,
ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া"

আর সেই সঙ্গে সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর ব্যর্থ আহরণ পদ্ধতি (Eclecticism) দেখিয়া ইহাও বলিতে ইচ্ছা হয়—

—"মিছে এদেশ সে দেশ করে বেড়াও,
বিধির লিপি কপাল যোড়া।"

* * * *

ঊনবিংশ শতাব্দী শাক্ত-বেদান্ত ছাড়িলেন, কেননা তাহা অদ্বৈতবাদ-ঘেঁসা, বৈষ্ণব-বেদান্ত ছাড়িলেন, কেননা "চৈতন্ত অকিঞ্চিৎকর ভ্রান্ত অবতার," আর—এই দুইকেই ছাড়িলেন, কেন না ইহারা পৌত্তলিক। আরও ছাড়িলেন, কেননা ইঁহাদের সম্বন্ধে কি সাধনাঙ্গে, কি তত্ত্বাঙ্গে—অতি অল্পই জানিতেন। এমনি করিয়া অজ্ঞতায় ও অধিকারের অভাবে যাহা উপেক্ষিত হইয়াছে, তাহা কি সত্যই আজ উপেক্ষণীয়? জাতির স্বভাবধর্ম্ম হইতে, স্বাভাবিক বিকাশ হইতে, এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া ও বিচ্ছিন্ন করিয়া যে পাঁচ ফুলের সাজি নির্ম্মান, তাহা কি বৈচিত্র্য, তাহা কি বিকাশ? তাহা কি অভিব্যক্তি? ইহাকে কি বলিব?—ইহা অনুকরণ, ইহা আত্ম-বিস্মরণ, ইহা অন্ধ-তিমিরাবগুণ্ঠনে পিচ্ছিল পথে আত্মঘাতী অভিসার, ইহা জাতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে এক অতি জঘন্য ব্যভিচার!

শ্রাবণ, ১৩২৬ সাল

বাঙ্গলায় ঊনবিংশ শতাব্দী

(৩)

আজ ঊনবিংশ শতাব্দীর পালা শেষ হইয়া গিয়াছে। তাই সংস্কার-যাত্রার সাজা রাজারা, তাহাদের ইউরোপ-বিশ্বের ভাড়াটিয়া পোষাক, আসরেই ফেলিয়া রাখিয়া, এই আসন্ন-প্রভাতকালে কোথায় যে একেএকে সরিয়া পড়িতেছেন—দিশাই পাইতেছি না।

যাত্রা ভঙ্গে সবই যেন ছত্রভঙ্গ দেখিতেছি। অথচ আবার গরম করিয়া আসর জমাইবার সূত্রপাতও দেখিতেছি। কেননা শুনিতেছি, দেশবাসী নাকি অসহ্যরূপে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এক যায়, আর আসে। গান চলে, পালা ফুরায় না। এমনি করিয়া যুগের পর যুগ—অনন্ত যুগ। তথাপি বাঙ্গালী ঊনবিংশ শতাব্দীতে কি পালা রচিয়াছিল, কি গাওনা গাইয়াছিল, খড়ো ঘরের মাটির দাওয়ায় বসিয়া আজ একবার তাহা ভাবিয়া দেখিব মনে করিয়াছি।

বাঙ্গালী বিভীষণ সাজিয়াছে, সুগ্রীব সাজিয়াছে। বড় বড় বাঙ্গালী বড় বড় বিভীষণ, বড় বড় সুগ্রীব। আমরা গরীব। পদ্মার ওপারের, যাকে বলে নিতান্ত বঙ্গজ। তথাপি সর্ব্বোত্তম নরলীলার প্রকাশ যে, বাঙ্গালীর মধ্যে সহস্র সূর্য্যের দীপ্তি লইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল,—সেই মহাপ্রভু একদিন আমাদের পদ্মাবতী তীরে বঙ্গদেশে পদধূলি দিয়াছিলেন।

"সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ব্ব বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য-সংকীর্ত্তন করে স্ত্রী-পুরুষে॥

(চৈঃ, ভাঃ আদিখণ্ড ৭৯ পৃঃ)

পদ্মাতীরের বঙ্গদেশ সেই সূর্য্যের তেজকে বরণ করিয়াছিল, ধারণ করিয়াছিল, সে শক্তি তার ছিল। আমাদের ব্রাহ্মণেরা সেদিন দিগ্বিজয়ী নিমাইএর 'টিপ্পনী' পড়িয়াছিল, 'সহস্র সহস্র শিষ্যকে' পড়াইয়াছিল। বাঙ্গালী সেদিন তার স্বভাবধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়াই নকল না করা সত্ত্বেও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইত। শ্রীশঙ্করের ব্যাখ্যা যে ব্যাসসূত্রের মুখ্য ব্যাখ্যা নহে, আর মায়াবাদ যে ভ্রম, পরিণামবাদই যে সত্য, ইহা চারিধামের লোককে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এবং মহাপ্রভু স্বয়ং—বেদান্তের ভূমিতে দাঁড়াইয়াই বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিত। আজ হয়তো স্বপ্ন বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু বাঙ্গালীরও একটা দর্শন ছিল, বেদান্ত ছিল। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গালীর সে দর্শনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অপারগ হইয়াছেন। ইহা নিন্দা নহে, বিদ্বেষ নহে, ইহা লজ্জা, মনস্তাপ ও আক্ষেপ।

বাঙ্গালীর ধর্ম্ম ও দর্শন সত্যি ছিল। সেই ধর্ম্ম ও দর্শন সেদিন বাঙ্গলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সূর্য্যরশ্মির মত ছড়াইয়া পড়িত। পদ্মাতীর তাই সেদিন বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্যকে—

"সুবর্ণ, রজত, জলপাত্র দিব্যাসন।
সুরঙ্গ কম্বল, বহুপ্রকার বসন॥"

(চৈঃ, ভাঃ আদিখণ্ড ৮০ পৃঃ)

উপঢৌকন দিয়া তার ঐশ্বর্য্যের, তার প্রাচুর্য্যের, তার আতি-

থেয়তা ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু পদ্মাতীরবাসীর আজ আর তা নাই। পদ্মার সেই ভীষণ ভাঙ্গন ও প্লাবনেও যে দেশ অটুট্ ছিল—আজ তাহা স্বখাদ সলিলে ডুবিয়া গিয়াছে। আজ আমাদের ধানের গোলা শূন্য, দীঘি পুষ্করিণী পঙ্কপূর্ণ,—চালে খড় নাই;—তুলসী-মঞ্চ ধসিয়া গিয়াছে,—শিবমন্দিরের ফাটালে ফাটালে অশ্বত্থ শিকড় গাড়িয়া মাথা তুলিয়াছে। তবু আমরা বিভীষণ ও সুগ্রীব সাজি নাই। আমরা এ যুগে কেবল পাছ দোহারেই গাহিয়া আসিয়াছি। কিন্তু সীতার উদ্ধার হইল কিনা, লক্ষ্মণের শক্তিশেল ঘুচিল কিনা—আজ আমরা জিজ্ঞাসা করিতে বসিয়াছি; তোমাদের,—সুগ্রীব, বিভীষণ সাজ যাহারা। বাঙ্গালী আজ তাহার এক শত বৎসরের হিসাব করিবে—ছাড়িবে না।

হিসাব করিবে, কেন—দুইশত বৎসরের ফরাসী দর্শনের অসার তর্জ্জমার গায়ে শঙ্করভাষ্যের দু'একটা গিল্‌টী তকমা পরাইয়া, বাঙ্গালী তাহাকেই বাঙ্গালীর দর্শন বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং সে চেষ্টার কি ফল হইল? সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর জাতির সংস্কার প্রয়াসের যে মানচিত্র, চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, তাহা তো অনেক্ষণ চাহিয়া দেখিতে পারি না!

শতবর্ষ পরে চাহিয়া দেখি, বাঙ্গলাদেশে আজ আর বাঙ্গালী নাই। বাঙ্গালী যে কি ছিল, কে ছিল, কাহারা ছিল, তাহার কোন চিহ্নও যাহাতে আর খুঁজিয়া পাওয়া না যায়, দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরিয়া এ কেবল তাহারই চেষ্টা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক অভূতপূর্ব্ব মিশ্রণের ধুয়া ধরিয়া, কেবল অনুকরণ ও ভাবদাসত্ব। ইহার নাটের গুরু কে—এবং কাহারা? তাহাদিগকে জিজ্ঞাস্য

এই যে—যাহা করিলে তাহাতে কি হইল? এবং কেন ইহা করিলে? কেহ বলিতে পার, কেন বাঙ্গলাদেশ হইতে বাঙ্গালী চলিয়া গেল? কোন্ পাপে? কিসে বাঙ্গালী সব হারাইল? আজ বাঙ্গালীর এ দশা কেন?

*　　*　　*　　*

নারায়ণ রথে উঠিয়াছেন। তাঁহার রথ চলিবে। পঙ্কাসূতা অথবা মিনিসূতার টানেও এ রথ চলিবে, থামিবে না। যদি বিরাট প্রতিষ্ঠা গত শত বৎসরে কিছু হইয়াই থাকে, তবে অগ্রে এই রথচক্রের নিম্নে তাহার পরীক্ষা হউক, নতুবা নহে।

*　　*　　*　　*

বাঙ্গালী পাপ করিয়াছে, প্রায়শ্চিত্য করে নাই, তাই কি বাঙ্গলা দেশ হইতে যে বাঙ্গালী, সে চলিয়া গিয়াছে? সে আর বাঙ্গলাদেশে নাই। জটাকেশরে মস্তক ছাইয়া পড়িয়াছে, নগ্নদেহে, নগ্নপদে বাঙ্গলার সিংহ বাঙ্গলার বাহিরে কোন্ বনে আজ নিঃশব্দে একলা বিচরণ করিতেছে? সে কি আর বাঙ্গলায় ফিরিবে না? হায় ঊনবিংশ শতাব্দী, তুমি কি করিয়াছ? কি করিয়াছ? বাঙ্গালীকে তুমি শুধু লক্ষ্মীছাড়া কর নাই, তাহাকে ঘরছাড়া করিয়া তবে ছাড়িয়াছ। সংস্কারের অছিলায় তুমি একটা জাতিকে প্রায় উচ্ছন্ন দিয়াছ। তোমার শতবর্ষের সংস্কারের ফল দেখ, বাঙ্গলা দেশে আজ আর বাঙ্গালী নাই।

এবং কেন? তাহাও জিজ্ঞাসা কর, ঐ ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার-ধর্ম্ম, সংস্কার-দর্শন আর সংস্কার-সাহিত্যকে। অনুকরণ করিয়া

জাতি বাঁচে না, মরে। বাঙ্গালীর স্বভাবধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অনুকরণ যুগ, এই আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী পরমুখাপেক্ষী সংস্কারযুগে—বাঙ্গালীর ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছে। কাহারও সর্ব্বনাশ করিতে হইলে যে, আগে তাহার ধর্ম্মনষ্ট করিতে হয়। তাই সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালীর ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে। কে এবং কাহারা ? তার পর, পরে পরে, বাঙ্গালীর দর্শন অন্ধ হইয়াছে, বাঙ্গালী সাহিত্য অনুকরণ ও উচ্ছিষ্ট বমন করিয়াছে। তাই 'মেঘনাদকে বধ' করিয়া, 'বৃত্রকে সংহার' করিয়া, বাঙ্গালী 'পলাশীর যুদ্ধে' হারিয়া গিয়াছে।

* * * * *

কেন এই একশত বৎসরের—

—পিত্তল কি কাটারী কামে নাহি আওল

উপরি কি ঝক্‌মকি সার ?

কারণ, বাঙ্গালী তাহার স্বভাবধর্ম্ম ভুলিয়া ভয়াবহ পরের ধর্ম্ম ভিক্ষা করিতে পথে বাহির হইয়াছিল। তাই আজিও বাঙ্গালীর, পরের ধর্ম্মকে 'আমার ধর্ম্ম' বলিয়া আস্ফালন করিতে লজ্জায় মাথা নত হইয়া পড়ে না, বাঙ্গালীর একটা ধর্ম্ম ছিল, সে ধর্ম্ম কথায় বুঝান যায় না, বাঙ্গালী মাত্রেই তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারে। কিন্তু আজ কিনা বাঙ্গালী নাই, তাই আশঙ্কা হয়, তার প্রাণ-ধর্ম্মের অস্তিত্বেও বুঝিবা বাঙ্গলার নরকঙ্কালেরা আস্থাহীন হইয়া পড়ে।

বৈশাখ, ১৩২৫ সাল।

"খাঁটি বাঙ্গালী।"

মাঘের 'সবুজ পত্রে' "খাঁটি বাঙালী" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে অজ্ঞতার পরিচায়ক অনেক আলোচনা অত্যন্ত অশিষ্টভাবে করা হইয়াছে। যাহা অজ্ঞতামূলক, তাহার সংশোধনের জন্য সম্যক্ জ্ঞানের আবশ্যক। যাহা অশিষ্ট, তাহাকে আর যাহাই হউক, প্রশ্রয় দেওয়া সঙ্গত নয়।

ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যের যে শ্রেণীর রচনাভঙ্গী অনুকরণ করিয়া, এই এক শ্রেণীর রচনা আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে দেখা দিয়াছে, তাহা ভাবে ও ভাষায়, আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারে কোন নূতন সম্পদ উপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ভাব ও ভঙ্গী রবীন্দ্রনাথ যত অনুকরণ করিয়াছেন, এত বোধ হয় আর কেহ করিবার সুযোগ পান নাই। তথাপি রবীন্দ্র-প্রতিভা, তাহার অতি নিপুণ ও চতুর অনুকরণ-সাহিত্যেও সর্ব্বদাই নিজের একটা ছাপ দিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রতিভা সকলের নাই। প্রতিভা নাই অথচ অনুকরণ করিবার সখ ও অবকাশ আছে, এমন লেখকদের যে রচনা তাহা বিদেশীয় মূলের সমকক্ষ নহে এবং তাহা জাতীয় সাহিত্যেও কোন নূতন সৃষ্টি নহে। প্রতিভাহীন লেখকদের অক্ষম অনুকরণকে, সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি বলিয়া গ্রহণ করিবার যুগ চলিয়া গিয়াছে।

যে রচনার মূলে একটা মৌলিক গবেষণা নাই, প্রতিভার একটা

নূতন বৈচিত্র্য নাই,—তাহার "দারিদ্র্য স্মরণ ক'রে অবনত মস্তক হয় না, বাঙলা সাহিত্যে এমন সমালোচক" ক্রমশঃই—"বিরল" হইয়া উঠিতেছে। এ অতিশয় সত্য কথা, এবং অনেকের পক্ষে ইহা আশঙ্কার কথাও বটে। প্রতিভা নাই, মৌলিকতা নাই,—অথচ বিদেশীয় নূতন রচনাভঙ্গীর ব্যর্থ অনুকরণের সহিত জাতীয় সভ্যতা, জাতীয় সাহিত্যের প্রতি নিতান্ত তুচ্ছতাচ্ছিল্যপূর্ণ ধৃষ্টতা মিশ্রিত আছে। ইহা এমন কে আছে—যিনি বলিবেন যে, প্রশ্রয়ের যোগ্য? বাঙ্গালার সভ্যতা ও বাঙ্গালীর সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা-পূর্ণ অজ্ঞতামূলক অশিষ্ট রচনা-পদ্ধতিকে আমরা প্রশ্রয় দিবার পক্ষাপাতী নহি।

প্রবন্ধকার বলিতেছেন—

"—বাঙালীর সুদুর-অতীত আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। প্রাক্-ব্রিটিশযুগের যে অতীতটুকু স্পষ্ট, তার গর্ব্ব করে অজ্ঞতার পরিচয় না দেওয়াই ভাল। রামমোহন হতে আরম্ভ করে আজও বাঙালীর জাতীয় জীবনের যে অধ্যায় চল্‌ছে, তা অতীতের কোন অধ্যায়ের চেয়ে গৌরবে কম নয়।"

বাঙ্গালীর অস্পষ্ট অতীতের অধ্যায়গুলির সহিত অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর রামমোহনী অধ্যায়ের যে তুলনামূলক বিচার প্রবন্ধ-লেখক অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে বস্তুতঃই—যে অনন্যসাধারণ অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে,—তাহা লেখকের কথাতেই বলিতেছি,—"না দেওয়াই ভাল" ছিল।

"খাঁটি বাঙালী"র অনুসন্ধানে বাহির হইয়া, নিজের স্বীকা-

রোক্তিতেই এই অজ্ঞ লেখক, ইতিহাস আলোড়নের স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছেন ;—

"— প্রাক্‌ব্রিটিশযুগের সাহিত্য থেকে একটি খাঁটি বাঙালীকে আমি খুঁজে বার করেছি। তিনি হচ্ছেন, ভারতচন্দ্রের ভবানন্দ মজুমদার।"

আবার নিতান্ত অবজ্ঞার সহিত বলিতেছেন,—

"মুদি বাথালি প্রভৃতি—খাঁটি বাঙালী,—যারা বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, মনসার গান, মতিরায়ের 'অজামিলের হরিপাদপদ্ম লাভ' প্রভৃতি খাঁটি বাঙলাসাহিত্যে মুগ্ধ—ইত্যাদি।"

জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও ধৃষ্টতায় ভরপূর এই শ্রেণীর লেখকের রচনাবিশ্লেষণ যে আমাদের করিতে হয়, তজ্জন্য আমরা বস্তুতঃই দুঃখিত।

বাঙ্গলার ইতিহাসে, প্রাক্‌ব্রিটিশ যুগেরই সমস্ত অতীতটুকু যাহার কাছে স্পষ্ট নয়,—প্রাক্‌ব্রিটিশ যুগের পূর্ব্বের অতীত যাহার কাছে ঘোর অমাবস্যার অন্ধকার, তাহার পক্ষে কি বাঙ্গালীর অতীত অধ্যায়গুলির সহিত ঊনবিংশ শতাব্দীর রামমোহনী অধ্যায় তুলনা না করিলেই নয়? কে মাথার দিব্য দিয়াছিল?

আজ মাত্র এক শতাব্দী পূর্ব্বে রামমোহনী অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছিল। রামমোহনের পূর্ব্বে, বাঙ্গালী হিন্দুযুগে, বৌদ্ধযুগে, পাঠান ও মোগল রাজত্বকালে,—ধর্ম্মে, সাহিত্যে, দর্শনে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, শিল্পে ও ললিতকলায়, কত বিচিত্র সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনে, কত বিবিধ সমাজবিন্যাসে, কত জগজ্জয়ী মহাপুরুষের অভ্যুদয়কে বক্ষে ধারণ করিয়া, মানব-সভ্যতার কত বিভিন্ন বিচিত্র

অবস্থানন্তর—একে একে অতিক্রম করিয়া, এক অতি ভয়াবহ শোণিত-পিচ্ছিল পথে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল, তাহা "হলধর দাস ও রহিম সেখ" যদি না জানে তবে তাহারা ক্ষমার যোগ্য, কেন না তাহারা বিলাতে গিয়া ইতিহাস পড়িবার সুযোগ পায় নাই ; কিন্তু যে লেখক সেই নিরক্ষর হলধর দাস ও রহিম সেখকে ব্যঙ্গ করিবার প্রলোভনটুকু সংবরণ করিতে পারে না, যে লেখক মুষ্টিমেয় ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর বাহিরে, বাঙ্গলার বিরাট জনসঙ্ঘকে, স্বামী বিবেকানন্দের পরে, 'মুদি-ম্যাথালি' বলিয়া অবজ্ঞা করিবার স্পর্দ্ধা করে, আর যে লেখক রামমোহনী যুগের সহিত বাঙ্গলার অতীত ইতিহাসের যুগগুলিকে, সম্পূর্ণ না জানিয়া তুলনা করে এবং তুলনায় রামমোহনের অতীতের যুগগুলিকে ধিক্কার দেয়, সে যদি না জানে তবে তাহার জন্য বাঙ্গলা সাহিত্য আজ কোন্ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিবে ?

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, "বাঙ্গালী একটা আত্মবিস্মৃত জাতি।" ইহা খুব সত্য কথা। কিন্তু একজন বাঙ্গালী-প্রধানের চিত্তেও যদি একথা জাগিয়া থাকে যে, বাঙ্গালী একটা আত্মবিস্মৃত জাতি, তখন বুঝিতে হইবে যে, সেই আত্মবিস্মরণ ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া, বাঙ্গালীর অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে একটা নব-জাগরণের যুগ আসিয়া দেখা দিয়াছে। এই সম্পর্কে বাঙ্গলার অতি দূর ইতিহাসের একটা কঙ্কাল, যাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে আমাদের সোৎসুক দৃষ্টির সম্মুখে আনিয়া ধরিতেছেন, "খাঁটি বাঙালী"র প্রবন্ধ লেখক যদি কিছুদিন অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের নিকট অধ্যয়ন করেন, তবে

আর যাহাই হউক, স্বজাতির অতীত ইতিহাসের অজ্ঞতা লইয়া প্রবন্ধ রচনার অহেতুকী খেয়াল হইতে সম্ভবতঃ অব্যাহতি পাইতে পারেন।

ব্রিটিশ যুগের পূর্ব্বের বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতা জানাইয়া স্পর্দ্ধা করিতে যাহার লজ্জা হয় না, তাহার লেখার সমালোচনা করিতে কিন্তু আমাদের স্বতঃই একটু লজ্জা হয়, মনস্তাপ ত হয়ই।

প্রবন্ধলেখক বাঙ্গালীর প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস আলোড়ন করিয়া ভবানন্দ মজুমদার পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিতে পারিয়াছেন। আমাদের আশঙ্কা ছিল, কি জানি বা এণ্টুনী ফিরিঙ্গীর ওধারে আর তাঁহার দৌড় চলিবে না। এই ভবানন্দ মজুমদারকে তিনি দেশদ্রোহীরূপে প্রমাণ করিয়া, বাঙ্গালীর অতীত ইতিহাসের একজন "খাঁটি বাঙালী"র আদর্শস্বরূপ ধরিয়াছেন।

যাঁহারা খাঁটি বাঙ্গালী তাঁহারা যে সকলেই দেশদ্রোহী ছিলেন, প্রবন্ধ লেখক এই কথাই স্পষ্ট প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর এবং ভবানন্দের সহিত "বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, বিবেকানন্দ, প্রফুল্লচন্দ্রকে তুলনা করিয়া, ভবানন্দের বাঙ্গলা হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্দ্ধের বাঙ্গলাকে বিশেষরূপে গৌরবের ভাগী করিয়াছেন। আমরা বিস্মিত হইতেছি যে, একজন অতি সাধারণ রকমের শিক্ষিত লোক'ও কি করিয়া ভবানন্দের সহিত, কতিপয় কবি, ধর্ম্মসংস্কারক, ও বিজ্ঞানবিদের তুলনা করিতে পারেন? আর যদি ব্যক্তিগত তুলনা ছাড়িয়া দিয়া ভবানন্দের যুগ, আর বঙ্কিম-বিবেকানন্দের যুগের তুলনাই অভিপ্রেত হয়, আর দেশভক্তিই যদি

এই দুই অসমান যুগের তুলনার মাপকাঠি হয়, তবে ভবানন্দের যুগ, রবীন্দ্রনাথের যুগের নিকট দেশভক্তিতে এত কি হীন বিবেচিত হইবে, আমরা ত বুঝি না। কেননা, যখন দেখিতেছি যে, প্রবন্ধ লেখক বিস্মৃত হন নাই যে, ভবানন্দের যুগে প্রতাপাদিত্যের মত বাঙ্গালীও ছিল। যে যুগে ভবানন্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপাদিত্য থাকে, সে যুগের খাঁটি বাঙ্গালীর আদর্শ কেবল ভবানন্দ একলা কেন হইবে, তাহা ত বুঝি না। ইহাই বাঙ্গলার অতীত ইতিহাস-বিচার!

আরও এক কথা। খাঁটি বাঙ্গালী হইতে গেলেই যে তাঁহাকে কবি বা ধর্ম্মসংস্কারক হইতে হইবে, বা বিনা তারের টেলিগ্রাফ প্রভৃতি আবিষ্কার করিতে হইবে, এমন কি কথা। খাঁটি বাঙ্গালীমাত্রই যে স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন এ কথাও ত কেহ বলে নাই। একটা জাতির মধ্যে ভাল মন্দ দুই থাকে। খাঁটী বাঙ্গালীর মধ্যেও তাই ছিল, অর্থাৎ ভবানন্দও ছিল, প্রতাপাদিত্যও ছিল। তবে প্রতাপাদিত্যকে ছাড়িয়া দিয়া কেবল ভবানন্দকে দিয়া যে লেখক প্রতাপাদিত্যের যুগকে বিচার করিতে কৃতসঙ্কল্প, তাহার প্রতি কৃপার উদ্রেক ভিন্ন আমাদের আর কিছুই হয় না।

ভবানন্দের বাঙ্গলা ছাড়িয়া 'পলাশীর যুদ্ধের ঠিক আগেকার দিনের বাঙালীর মূর্ত্তি' দেখিয়াও প্রবন্ধ লেখক তাহাকে রামমোহনী যুগের তুলনায় ধিক্কার দিয়াছেন। "মীরজাফর ও রাজবল্লভের বাঙলাকে" যখন "আদর্শ বলে প্রচার" করা হয়, তখন প্রবন্ধ-লেখক নাকি "স্তম্ভিত" হয়ে যান! পলাশীর যুদ্ধের যুগে

মীরজাফর ও রাজবল্লভই, বাঙ্গলায় মুসলমান ও হিন্দুর আদর্শ ছিল না। পরবর্ত্তী সাহিত্যেও ইহাদিগকে কেহ আদর্শ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। তথাপি প্রবন্ধ লেখক মুসলমান ও হিন্দুর পক্ষ হইতে মীরজাফর ও রাজবল্লভকেই কেন যে আদর্শ-বাঙ্গালী বলিয়া ধরিয়া লইবেন, তাহার কোন কারণ তিনিও দিতে অক্ষম, এবং আমরাও বুঝিতে বিশেষ সক্ষম নই।

ভবানন্দ ও কৃষ্ণচন্দ্র বাঙ্গলার অতি বড় দুইটি সঙ্কটযুগের দুইটি অধ্যায়।

ইতিহাস বিচার করিতে হইলে, সেই সঙ্কটযুগের সকল ঘটনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, এই দুইটি বা এই শ্রেণীর আরো দুই চারিটি ব্যক্তিত্বকে বিচার করিলে, ইহাদের উপর সুবিচার করা হইবে না। আর সেই সঙ্কটযুগের সকল ঘটনা এখনও আমরা যথাযথ জানিতে পারি নাই। সুতরাং মিথ্যা ইতিহাস, কিম্বদন্তী বা জনশ্রুতি, অথবা কল্পনা—অথবা অন্ধ-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গলার ইতিহাসের "নন্দকুমার" প্রভৃতি অতীত যুগের প্রখর ব্যক্তিত্বশালী পুরুষদিগকে প্রবন্ধ লেখক যেরূপ সরাসরি বিচার করিয়া দেশদ্রোহী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন, এবং সেই মিথ্যাকল্পনাকে ইতিহাস মনে করিয়া যে সমস্ত কল্পিত আদর্শকে "খাঁটি বাঙালী"র আদর্শ বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই ভ্রমাত্মক।

একটা অধঃপতনের যুগের সহিত তাহার পরবর্ত্তী আর একটা নব অভ্যুদয়ের যুগের তুলনায়, বিচার বিশ্লেষণে যেরূপ সতর্ক

হওয়া প্রয়োজন, যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা বিধেয়, প্রবন্ধলেখক তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য ইতিহাস আলোচনার নূতন পদ্ধতিগুলিও যদি প্রবন্ধলেখকের আয়ত্ত থাকিত, তবে হয়ত এতটা ভ্রমপ্রমাদের হস্তে তাঁহাকে পড়িতে হইত না।

বাঙ্গালী জাতি একটা জীবন্তজাতি। জীবন্ত জাতিমাত্রই যুগে যুগে পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া তাহার অন্তর্নিহিত প্রকৃতির নানা বিচিত্র বিকাশ দেখাইয়া ইতিহাসের পথ আলো করিয়া চলিতেছে সহস্রাধিক বৎসরের সাহিত্য আজি যে জাতি দাবী করিতেছে, সহস্রাধিক বৎসরের স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে যে জাতি তাহার ইতিহাসের নিদর্শন বাহির করিয়া দেখাইতেছে, সমগ্র ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যের ইতিহাসে যে জাতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল পরাক্রান্ত অথচ অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিল, ভারতবর্ষের বাহিরে যে জাতি সর্ব্বাগ্রে এবং সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ভারতবর্ষের মহিমা ঘোষণা করিয়াছে,—যাহার ধর্ম্ম ছিল না তাহাকে ধর্ম্ম দান করিয়াছে, যাহার নীতি ছিল না তাহাকে নীতি দান করিয়াছে—যাহার সমাজ-শৃঙ্খলা ছিল না তাহাকে সমাজ-বিন্যাসের অপূর্ব্ব রচনা-কৌশল শিক্ষা দিয়াছে—যে জাতির শিল্প অতি সুসভ্য জাতি সকলও অত্যন্ত সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছে—যে জাতি কি দিগ্বিজয়ে, কি বাণিজ্যবিস্তারে পর্ব্বত, অরণ্যানী ও মরুভূমি হেলায় অতিক্রম করিয়া গিয়াছে —ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মহাসাগরবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ছুটিয়াছে—ইতিহাস বলে, সেই জাতিই এই বাঙ্গালী জাতি।

বাঙ্গালীর অতীত ইতিহাসের ধারা আমাদের মধ্যে লুপ্ত হইতে

বসিয়াছিল। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী—তাহার প্রথমে যত বড় রামমোহনই আসুন না কেন—আমাদিগকে আমাদের সুদূর অতীতের এক গৌরবময় ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমাদের আত্ম-বিস্মৃতির দুর্য্যোগের দিনে আমরা আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছিলাম। এখনও তাহার ঝোঁক আমরা একেবারে সামলাইয়া উঠিতে পারি নাই। আর তাই পারি নাই বলিয়াই বাঙ্গলার অতীত ইতিহাসের দৌড় ভবানন্দ পর্য্যন্ত গিয়াই থামিয়া যায়।

এই সমস্ত বিলাতী বাঙালীকে (?) কে বলিয়া দিবে যে, বাঙ্গালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, গৌরবে তাহা পৃথিবীর ইতিহাসের বহু সাম্রাজ্যের সহিত তুলনীয়। বাঙ্গালী বীর ছিল, সে যুদ্ধ করিয়াছে, সে দিগ্বিজয় করিয়াছে। বাঙ্গালীর জয়গৌরবে "দাক্ষিণাত্যের শিল্পরুচি অতিক্রান্ত হইয়াছিল, লাট দেশের কমনীয় কান্তি আবিল হইয়া গিয়াছিল, অঙ্গদেশ অবনত হইয়া পড়িয়াছিল, কর্ণাটের লোলুপ দৃষ্টি অধোমুখে অবস্থিত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, মধ্যদেশের রাজ্যসীমা সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল।" ইহা ইতিহাস। বাঙ্গালীর সুদূর অতীতের ইতিহাস না পড়িলে, না জানিলে, আমরা কি করিতে পারি; শুধু বলিতে পারি যে, এই না-জানার উপর নির্ভর করিয়া বলা উচিত নয় যে, বাঙ্গালীর সুদূর অতীতের ইতিহাস নাই। সূর্য্যের অস্তিত্ব যেমন অন্ধের দৃষ্টির উপর নির্ভর করে না, খাঁটি বাঙ্গালীর অস্তিত্বও তেমনি বিলাতী—(?) বাঙ্গালীর অজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না। খাঁটি বাঙ্গালী, যুগে যুগে বিচিত্র বিকাশের মধ্য দিয়া বিশ্বের অনন্ত

লীলা-স্রোতে ছুটিয়াছে,—ছুটিবে। অন্ধ ঐতিহাসিকের অজ্ঞতাকে সে ভ্রূক্ষেপ করিবে না; আর পথের ধূলি যে জাতীয় অবমাননা-কারী অশিষ্ট আবর্জ্জনা সাহিত্য—তাহাকে সে প্রতি পদবিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে দলিত ও লাঞ্ছিত করিবেই করিবে। কেন না, খাঁটি বাঙ্গালী মরে নাই, খাঁটি বাঙ্গালী মরিবে না। বিশ্বে সে অমর হইয়া আসিয়াছে।

চৈত্র, ১৩২৫ সাল

বাঙ্গালীর সেবাধর্ম্ম

বাঙ্গালীর সেবাধর্ম্মের প্রকৃতি কি, বৈশিষ্ট্য কোথায়? উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার-যুগে, এবং বিংশ শতাব্দীর প্রতিক্রিয়ামূলক সমন্বয়-যুগে বাঙ্গালীর সেবাধর্ম্ম কি নব বৈচিত্র্যে বিকশিত হইয়াছে, ক্রমোন্নতি লাভ করিয়াছে, অথবা ইহা অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমাদের বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গলায় শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একটা সেবাধর্ম্ম ছিল। শাক্ত ও বৈষ্ণব জগতের প্রতি, জীবের প্রতি, সমাজের প্রতি যে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাইতেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম-সাধনায় যেরূপ কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ ছিল, তাহাতে প্রাক্‌ব্রিটিশ যুগে শাক্ত ও বৈষ্ণবের সেবাধর্ম্মের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। বাঙ্গালী একদিন বৌদ্ধ ছিল। ভগবান্ বুদ্ধের সেবাধর্ম্ম, পরবর্ত্তী হিন্দু-ধর্ম্মের দুইটি বিশেষ সাধনমার্গে—শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কতটা রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা কেহই ভালরূপ ভাবিয়া দেখেন নাই। বাঙ্গালীর স্মৃতি, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের স্মৃতি হইতে পৃথক্। স্মৃতির পার্থক্যে সমাজবিন্যাসেরও পার্থক্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। বাঙ্গালীর সমাজবিন্যাস হইতে ও স্মৃতি হইতে বাঙ্গালী হিন্দুর সেবাধর্ম্মের প্রকৃত রূপটি বহু পরিমাণে আমাদের চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। এই সেবাধর্ম্মের মধ্যেই জাতির নৈতিক উন্নতি বা অবনতির চিহ্ন আমরা পাই।

রাজা রামমোহন, এ যুগে জাতীয় সংস্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া

সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন যে, হিন্দুর ধর্ম্ম-চিন্তার দিক্‌টা যে রকম উন্নত, নীতির দিক্‌টা তেমনি অবনত। পরন্তু খ্রীষ্টান-ধর্ম্মের নীতি-বাদ খুব উচ্চ এবং আমাদের অনুকরণযোগ্য। বাঙ্গালী হিন্দুর তান্ত্রিক ধর্ম্মমত এবং তাহার অনুরূপ সাধনা রামমোহনকে সমধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল। অন্য পক্ষে বৈষ্ণব-ধর্ম্মতত্ত্ব, বৈষ্ণব-সাধনা ও বৈষ্ণব-নীতিমার্গ রামমোহনের নিকট বিশেষরূপে উপেক্ষিত হইয়াছিল। কেহ বলিতে পারেন, এবং বলিয়া থাকেন যে, তখন তাহার প্রয়োজন হইয়াছিল। ইতিহাসে যাহা ঘটে, তাহাই একমাত্র প্রয়োজন, এবং তাহার অতিরিক্ত আর কিছু ঘটা অসম্ভব, এই সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তী হইলে অবশ্য যাহা যাহা উনবিংশ শতাব্দীতে ঘটিয়াছে, তাহাই সমর্থনযোগ্য এবং তাহার উপর আর কথা বলা চলে না। কিন্তু ইতিহাস এবং যুগধর্ম্ম যদি মনুষ্য-চিন্তার বিচারাধীন হয়, তাহা হইলে কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি জাতীয় জীবনে যাহা ঘটে, তাহাকেই সমর্থন করা যায় না। রাজা রাম-মোহন শাঙ্কর অদ্বৈতবাদকে গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীর ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাহার সহিত "লোকশ্রেয়ো"রূপ সামাজিক নীতিবাদকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কর্ম্মসন্ন্যাসের প্রয়োজনীয়তাকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ গ্রহণ করিলে কর্ম্মসন্ন্যাসকে অবস্থা, কাল ও অধিকারি-ভেদে একেবারে অস্বীকার করা অনেক সময়ে বড়ই কঠিন সমস্যা। তথাপি রামমোহন মধ্যযুগীয় কর্ম্মবিমুখতাকে অত্যন্ত তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, এবং তাহার নিরসনকল্পে শাস্ত্র ও যুক্তিকে সব্যসাচীর মত প্রয়োগ করিয়াছেন। অনেকের মতে এই লোক-

শ্রেয়ের প্রতিষ্ঠাই এ যুগে রাজা রামমোহনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। বাঙ্গালীর এ যুগের সেবাধর্ম্মে রামমোহনের "লোকশ্রেয়ে"র কি বিশেষত্ব, তাহা যুগবিশ্লেষণকারী চিন্তাশীল মনীষীদিগের সবিশেষ আলোচ্য, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টান নীতিবাদের উপরেই লোকশ্রেয়ের ভিত্তি। আর এই খৃষ্টান নীতিবাদের অর্থ রামমোহন এইরূপ বুঝিয়াছিলেন ও বুঝাইয়াছিলেন যে, "তোমার উপর অন্যের যেরূপ ব্যবহার তুমি ইচ্ছা কর, অন্যের প্রতিও তুমি সেইরূপ ব্যবহার কর।" বলা বাহুল্য, শাঙ্কর অদ্বৈতের ভিত্তির উপর রামমোহন তাঁহার লোক-শ্রেয়োরূপ নীতিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। বৈষ্ণব-বেদান্ত বা লীলাতত্ত্বের উপরেও রামমোহনের নীতিবাদ প্রতিষ্ঠিত নহে। রামমোহন-বন্ধু জেরেমি বেন্থামের নীতিবাদ অপেক্ষা "লোকশ্রেয়ে"র বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠত্বও অনেকে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, রামমোহনের লোকশ্রেয়ের দার্শনিক ভিত্তি, শাঙ্কর-বেদান্ত-ঘেঁসা বাঙ্গালীর শাক্ত-বেদান্তেও নহে, আর মহাপ্রভু-প্রতিষ্ঠিত এবং জীব-বলদেব-ব্যাখ্যাত বৈষ্ণব-বেদান্তেও নহে।

সুতরাং রামমোহন যে সেবাধর্ম্ম বাঙ্গালীকে দিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল বাঙ্গালীর ধর্ম্মতত্ত্ব ও সাধনমার্গের মধ্যে তত নাই—যত খ্রীষ্টান নীতিবাদের মধ্যে আছে। রামমোহন-পন্থীরা বলিবেন, ইহারও প্রয়োজন ছিল, ইহাও যুগপ্রয়োজনের ফল। একটা বৈদে-শিক সভ্যতা কর্ত্তৃক সম্যক্ বিপর্য্যস্ত যে যুগ, তাহাকে বাঙ্গলা দেশে চিরস্থায়িরূপে আমরা স্বীকার করিতে পারি না। ইতিহাসে যুগের পরে যুগ আসে। পূর্ব্বগামী যুগের সাধনা লইয়া, তাহার ভুল-ত্রুটি

সংশোধন করিয়া, পরবর্ত্তী যুগ রূপান্তর গ্রহণ করে। বাঙ্গলা দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে হইয়াছেও তাহাই। রামমোহনের পরবর্ত্তী যুগের লক্ষণসমূহকে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া, তাহার দ্যোতনাকে ফুটাইয়া তুলিতে গিয়া, আমরা রাজা রামমোহনের যে সমালোচনা করিয়াছিলাম, কেহ কেহ তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন। কিন্তু সময় আসিয়াছে—যখন আপত্তি সত্ত্বেও আমাদিগকে যাহা কর্ত্তব্য, তাহার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

রামমোহনের পরে দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনতত্ত্ব বা তাহার দার্শনিক ভিত্তি অথবা সেই দার্শনিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত যে নীতিবাদ এবং সেবাধর্ম্ম, তাহার কোনরূপ আলোচনা করেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের সগুণ ব্রহ্মের উপর সাধনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে মিল, বেন্থামের 'অধিকাংশের সুখবাদ' নিরসন করিয়া, ক্যাণ্ট ফিক্টের কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ নীতিবাদকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্যাণ্ট ফিক্টের নীতিবাদের সহিত ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ অথবা ক্যাণ্ট ফিক্টের নীতিবাদ যে বস্তু, দেবেন্দ্রনাথ তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কাজেই তাঁহাকে মার্টিনোর নীতিবাদকে হুবহু গ্রহণ করিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য, দেবেন্দ্রনাথের সময়ে নীতিবাদ বাঙ্গলা দেশে আসিয়া দেখা দিয়াছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Institutions) গুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, বাঙ্গালী হিন্দুর নীতিবাদের বা সেবাধর্ম্মের কোন অভিনব উন্নত ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই সাক্ষাৎভাবে সমাজ-সংস্কার হইতে তিনি

সমধিক সঙ্কুচিত ছিলেন বলিয়াই, সম্ভবতঃ বাঙ্গালীর সেবাধর্ম্মে, কি কর্ম্মক্ষেত্রে, কি চিন্তাক্ষেত্রে তাঁহার স্থান খুব উঁচে নহে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমসাময়িক যুগপৎ পৌরুষ এবং দয়ার অবতার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যে সেবাধর্ম্মের এক অত্যুজ্জ্বল মূর্ত্তি অতি আশ্চর্য্যরকমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ইহার কঠোরতা ও প্রচণ্ডতা যেমন ভীষণ, ইহার অফুরন্ত দয়ার স্রোতও তেমনি গঙ্গাজলের মত স্নিগ্ধ ও সুশীতল। বাঙ্গলা দেশে একদিন সেবা-ধর্ম্মের একটি পর্ব্বত আকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল, সেই অটল হিমাচল হইতে হৃষীকেশের গঙ্গাবারি বাঙ্গলা দেশকে প্লাবিত করিয়া গিয়াছে। রুদ্রের জটা হইতেই দয়া ও সেবার গঙ্গা ঝরিয়া পড়িয়াছিল। ইহার উৎপত্তি শাক্ত ও বৈষ্ণব-বেদান্তেও নহে, খ্রীষ্টান অথবা ক্যাণ্ট ফিক্টের দার্শনিক ভূমিতেও নহে। বিধবার দুঃখে এত বড় পৌরুষ ও মহত্ত্বের বাণী বাঙ্গলা দেশে আর গর্জ্জে নাই, ক্ষুধিত ও দুঃস্থের হাহাকারে এত বড় দয়ার প্রবাহ বাঙ্গলা দেশে আর দেখা যায় নাই। মানুষের জন্য মানুষের যে সমবেদনা, সম-অনুভূতি, ঊনবিংশ শতাব্দার এই চিরস্মরণীয় চরিত্রে, আমরা তাহাই দেখিতে পাই। স্তম্ভিত ও বিস্মিত হই,—ভয়ও যে না পাই, তাহা নহে, কেননা, চীৎকারও ত করি? প্রচণ্ডতাকে সহ্য করিবার শক্তি, তাহা সে দয়ারই হউক আর অত্যাচারেরই হউক, বাঙ্গালীর নাই।

বিদ্যাসাগরের পর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া খ্রীষ্টান পাত্রীদিগের সেবাধর্ম্মের অনুকরণে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে সেবাধর্ম্মের প্রচার করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। আদর্শ

এবং উপায় বিদেশী হওয়ার জন্যই হউক, ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর সহিত ইংরেজী অশিক্ষিত বাঙ্গালীর একটা মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদের জন্যই হউক, অথবা আর যে কারণেই হউক, কেশবচন্দ্রের সেবাধর্ম্ম বাঙ্গলায় সম্যক্ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই।

গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ যখন দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবের অনুগামী ব্রাহ্ম ছিলেন, তখনই তাঁহার মধ্যে সেবাধর্ম্মের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা ব্রাহ্ম হইয়া সেবার ভার নিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণের সমতুল্য কেহই নহেন; দেবেন্দ্রনাথও নহেন, কেশবচন্দ্রও নহেন। উত্তরকালে যখন একদিন গেণ্ডেরিয়ার জঙ্গল হইতে এই কেশরী সহসা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের জীবন্ত মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বহির হইয়া পড়িলেন, শিক্ষিত বাঙ্গালীর ইতিহাসে ব্রাহ্মযুগ যখন অস্তমিত, দক্ষিণেশ্বরে মাতৃভাবে কালী-সাধনায় সিদ্ধ পরমহংস রামকৃষ্ণের যখন অভ্যুদয়, সেই যুগ-পরিবর্ত্তনকালে; বাঙ্গালী শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনমার্গের দুই সিদ্ধ মহাপুরুষ যখন বাঙ্গলার ভাবী যুগে অভ্যুদয়কে সূচনা করিলেন, সেই সময় হইতে আজ এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রহর পর্য্যন্ত, বাঙ্গালীর সেবাধর্ম্মের গতি ধীরভাবে নিরীক্ষণ করিতে হইবে। এ যুগ—রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের, শাক্ত ও বৈষ্ণবের,—এক কথায় বাঙ্গালীর সাধনা ও সিদ্ধিকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে। এ যুগে ব্রাহ্মধর্ম্ম অপসৃত, পর্য্যুদস্ত। ব্রাহ্মনেতৃগণ সময় নিকটবর্ত্তী দেখিয়া কালপুরুষের অঙ্গুলি-সঙ্কেত বুঝিয়া, তাড়াতাড়ি ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাস লিখিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

তাহাতে দুঃখ কি? আর তাহাতে লজ্জাই বা কি? তরঙ্গের

পরে তরঙ্গ উঠে, নদী অগ্রসর হয়। যুগের পরে যুগ আসে, জাতি অগ্রসর হয়।

আমরা বলিয়াছি এবং আবার বলি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ রামকৃষ্ণ-বিজয়কৃষ্ণের যুগ। এ যুগ শাক্ত ও বৈষ্ণবের যুগ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে, সাধনধর্ম্মে শাক্ত ও বৈষ্ণব ছিল, বিংশ শতাব্দীতেও তাহাই আছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ শুধু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রতিধ্বনি বা ফটোগ্রাফ নহে; বিংশ শতাব্দীর জীবন্ত বিগ্রহ। উনবিংশ শতাব্দীর পরিবর্ত্তন ও উন্নতির চিহ্নসমূহ তাঁহারা ধারণ করিয়া তবে বাঙ্গালীর ভাবী যুগের সূত্রপাত করিয়াছেন। তাঁহারা বাঙ্গালীর শাক্ত ও বৈষ্ণবের ধারায়, বাঙ্গলার প্রাণের ধারায়, অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া ইতিহাসের নিয়ামকরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। এখন প্রশ্ন এই, এই দুই সাধন-ধারায় সেবাধর্ম্ম কি 'রূপ' গ্রহণ করিয়াছে? আমরা বলিয়াছি, প্রাক্‌ব্রিটিশ-যুগের শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনায় এবং তদীয় সেবাধর্ম্মে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচ্ছন্ন হস্ত কার্য্য করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে আবার বাঙ্গালীর শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনায়, রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম্মানুভূতিতে সেবাধর্ম্মে খৃষ্টান অথবা পাশ্চাত্য সভ্যতার হস্ত প্রচ্ছন্নে কার্য্য করিতেছে কি না? তাহার কতটা অপরিহার্য্য, কতটাই বা বর্জ্জনীয়?

পরমহংস রামকৃষ্ণ ধর্ম্মের রাজসূয়যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার নামাঙ্কিত অশ্ব নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ছুটিয়াছিল, আটলাণ্টিকের 'উত্তরীয়' দিগ্বিজয়ের জয়নির্ঘোষে প্রতিধ্বনিত

হইয়াছিল। ইহা অলৌকিক, আশ্চর্য্য—অথচ বাঙ্গালী ইহা পারিয়াছে! কিন্তু বিবেচ্য এই, স্বামী বিবেকানন্দের যে সেবাধর্ম্ম, তাহার ভিত্তি কোথায়?

শাঙ্কর অদ্বৈতে ধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া রামমোহন খৃষ্টান নীতিবাদের সাহায্যে সেবাধর্ম্ম প্রচলন করিতে গিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতের ভূমিতেই রামকৃষ্ণের সেবাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রামমোহন হইতে বিবেকানন্দের এইখানে একটি খুব বড় প্রস্থান। রামমোহন হইতে বিবেকানন্দ এইখানে অধিকতর আত্মস্থ ও গৌরবান্বিত।

স্বামী বিবেকানন্দ যেন জ্ঞাতসারেই রামমোহনকে নিরসন করিয়াছেন। বিবেকানন্দ খৃষ্টান সেবাধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তিকে আক্রমণ করিয়া বলিতেন, "খৃষ্টান বলেন, প্রতিবেশীকে ভালবাস, কিন্তু কেন, তাহার কোন উত্তর দিতে পারেন না।" স্বামীজির যুক্তি এই, প্রতিবেশীকে কেন ভালবাসিব? প্রতিবেশী আমার কে? সে দুঃখ পায়, তাতে আমার কি? ভগবানের আদেশ? আমি যদি না মানি? যে আদেশে আমি না বুঝিয়া যন্ত্রবৎ চালিত হইব, সে-আদেশ আমাকে যন্ত্রই করিবে। কাজেই খৃষ্টান সেবাধর্ম্মের কোন ভিত্তি নাই। অন্যপক্ষে অদ্বৈত বেদান্ত বলেন; কেহ তোমার প্রতিবেশী নয়, তুমিই সব। সুতরাং তুমি কি তোমার দুঃখ দূর করিবে না? জগতের যেখানে যে অত্যাচার প্রপীড়িত, অনাহারে ও রোগে ক্লিষ্ট, সেখানে তুমিই তাহাদের মধ্যে দুঃখ পাইতেছ। জ্ঞান দ্বারা এই বোধ, এই উপলব্ধি আয়ত্ত করিয়া জগতের সেবা কর। বাঙ্গালীর নবযুগের সেবাধর্ম্মের এই তত্ত্ব। রামকৃষ্ণ-

বিবেকানন্দ-সম্প্রদায় এই অদ্বৈত-তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া এ যুগে সেবাধর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন।

কিন্তু শাক্ত বা অদ্বৈত বেদান্তই বাঙ্গালীর এ যুগের একমাত্র সাধন-ধারা নয়। মহাপ্রভুর যে ধর্ম্ম বিজয়কৃষ্ণে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল, সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের, তাহার সাধনায় এ যুগে সেবাধর্ম্ম কি রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এবং করিয়াছে কি না, তাহাও দেখিতে হইবে।

বিজয়কৃষ্ণ এ যুগে যে ধর্ম্মের অবতার, নবদ্বীপে "নিত্যানন্দ-সেবাশ্রম ও মাতৃমন্দির" সেই বাঙ্গালীর প্রাণধর্ম্মের সেবার প্রতিষ্ঠান। বৈষ্ণব বেদান্তে বলে, 'তুমি আমার, আমি তোমার।' তুমি যদি আমার, হে দুঃস্থ নিঃসহায়, এস, আমার বক্ষে এস, আমার বাহুর বন্ধনে এস। তোমার ক্ষুধা আমাকে দাও, তোমার ব্যাধি আমাকে দাও, তোমার পাপ—হে লম্পট,—হে কুলটা তাও আমাকে দাও। কেননা, তুমি যে আমার। আমি যে তোমার। যাহা আমার, তাহাকে আমি বর্জ্জন করিব কিরূপে? এই ভাবের প্রেরণা হইতে নবদ্বীপের সেবাশ্রম ও মাতৃমন্দির। ইহা বাঙ্গালীর বৈষ্ণব বেদান্তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের পরে বাঙ্গালী বিধবার দুঃখে নবদ্বীপে মাতৃমন্দির যে সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছে, তাহার পৌরুষ ও মহত্ত্ব, তাহার জন্য লাঞ্ছনা-ভোগ ও নির্য্যাতন সহ্য করা বাঙ্গলার একদল অখ্যাত সেবকমণ্ডলীকে লোকচক্ষুর অন্তরালে ইতিহাসে স্মরণীয় করিতেছে।

আষাঢ়, ১৩২৬ সাল

তৃতীয় স্তবক

সাহিত্যে—বাঙ্গলার রূপ।

তোমরা কি বাঙ্গলার রূপ দেখ নাই? দিকে দিকে উছলিয়া পড়িতেছে—রূপ—তাহা দেখ নাই? আলুলায়িত কানন-কুন্তল দেখ নাই? শস্যের অঞ্চল দেখ নাই? গঙ্গা ও পদ্মার বুকে তরঙ্গ দেখ নাই? তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটিয়াছে, দেখ নাই? অনন্ত, অফুরন্ত রূপের তরঙ্গ,—রৌদ্রে ঝলমল্, জ্যোৎস্নায় পুলক চঞ্চল,—মৃদু মন্দ মলয় হিল্লোলে দুলিতে দুলিতে এই স্রোতধারা কোন সাগর উদ্দেশ্যে ছুটিয়াছে,—দেখ নাই?

একি নদী, কত তার তরঙ্গ-ভঙ্গী। একি বাঙ্গলা, কত তার বিচিত্র রূপ। বিচিত্ররূপিণী জননী বঙ্গভূমি,—বাঙ্গালীর চক্ষের বাঁধন খুলিয়া দাও। বাঙ্গালীকে তোমার অনন্তরূপের এক কণিকা দেখাও।

রূপের জন্য পাগল না হইলে—রূপ দেখা যায় না। বাঙ্গলায় এই দিব্যোন্মাদ যাহার হইয়াছে, সেই বাঙ্গলার রূপ দেখিয়াছে। বাঙ্গলার রূপ দেখিয়াছে চণ্ডীদাস, বাঙ্গলার রূপ দেখিয়াছে রামপ্রসাদ। তাঁহারা সে রূপ শুধু দেখে নাই,—সে রূপের মূর্ত্তি গড়িয়াছে। তাঁহারা পারিয়াছিল,—আমরা পারি নাই,—পারিলাম না। স্বরূপ না জানিলে রূপের জন্ম দেওয়া যায় না। একে দুই, আবার দুইয়ে এক, এই অচিন্ত্যনীয় ভেদাভেদ বুঝান যায় না। কল্পকলায় রূপান্তর হয় না। তবে কি এ যুগের বাঙ্গালী বাঙ্গলার স্বরূপ বুঝিবে না?

বাঙ্গলায় কত যুগ আছে,—কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? বাঙ্গলা, গ্রীস, রোম, মিশর, ব্যাবিলনের চেয়েও প্রাচীন কিনা—কে বলিবে? সন্দেহ জাগিয়াছে, প্রশ্ন উঠিয়াছে, মীমাংসা বহুদূর। অতীত যুগের বাঙ্গলার প্রাণ হইতে কোন্ কোন্ রূপের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাও আমরা জানি না। সেই রূপের মূর্ত্তি কোথায়? সেই মূর্ত্তি-স্রোতে একবার কি ভাসিতে পারি না?

বাঙ্গলায় বৌদ্ধযুগ লইয়া আলোচনা চলিয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্যে তার দু' একটা স্ফুলিঙ্গ, দেখা যাইতেছে। রাণী প্রশ্ন করিতেছেন—

কোথায় উৎপত্তি হইল পৃথিবী সংসার।
কোথায় রহিল পুনঃ কহ সমাচার॥
মরণ কিবা হেতু জীবন কিরূপ।
ইহার উত্তর যোগী কহিবা স্বরূপ॥

যোগী উত্তর করিতেছেন—

শূন্য হইতে আসিয়াছি পৃথিবীতে স্থিতি।
আপনি জল স্থল আপনি আকাশ।
আপনি চন্দ্র সূর্য্য জগতে প্রকাশ॥

বাঙ্গলা একদিন এই মহাশূন্যবাদ ও নাস্তিকতার রূপেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে রাজা সিংহাসন, দণ্ড, মুকুট পরিত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া যাইতেছেন। সংসার অনিত্য। রাজত্ব—দু'দণ্ডের।

রাণী কাঁদিয়া আকুল।

না ছাড়্য না ছাড়্য মোরে বঙ্গের গোসাঞি।
তোমাবিনা উড়না থাকিবে কোন্ ঠাঞি॥
নারী পুরুষ দুই হয় এক অঙ্গ।
শিব বটে যোগীয়া ভবানী তার সঙ্গ॥

বৌদ্ধনিবৃত্তির শুষ্ক ক্ষুরধার শানিতপথে প্রেমিকার আসন্ন বিরহের ভয়ে মর্ম্মভেদী কাতরতা, এই প্রেমকাহিনী, ইহাও বাঙ্গলার রূপ। কি সন্ন্যাসে কি প্রেমে, বাঙ্গালী—বাঙ্গালী। বৌদ্ধপ্লাবনে বাঙ্গলার স্বভাবধর্ম্মই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালী রামায়ণ ও মহাভারত শুধু অনুবাদ করে নাই। রচনা করিয়াছে। দোষেগুণে বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালীর মহাকাব্যও অতিক্রম করিতে পারে নাই। রামায়ণ ও মহাভারতের অতুলনীয় চরিত্রগুলিও বাঙ্গলার রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাঙ্গলার সুরে সুর মিলাইয়াছে।

ধর্ম্মে দৃঢ়তা, প্রেমে সতীত্ব—মহাকাব্যের ছায়ানুবর্ত্তী না হইয়া নিজ স্বাতন্ত্র্যের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাকে রূপ দিয়াছে। চাঁদসদাগর ও বেহুলা—বাঙ্গলার শুধু কাব্য নয়, ইতিহাস। বাঙ্গালী কি চক্ষু ভরিয়া তাহার চাঁদসদাগর ও বেহুলার রূপ দেখিবে না? কে ইহা সৃষ্টি করিল? ইহার স্বরূপ কোথায়? বাঙ্গালী ইহা সৃষ্টি করিয়াছে। বাঙ্গলার প্রাণ হইতে ইহা রূপ পাইয়াছে, কাব্যে রূপান্তরিত হইয়াছে।

বেহুলার একনিষ্ঠ সতীত্বের যে রূপ তাহাও বাঙ্গলার, আবার শ্রীরাধার প্রেমের যে রূপ তাহাও বাঙ্গলার। রূপবৈচিত্র্যে

বাঙ্গলার রূপ

বাঙ্গলা আমার ভরপুর। চণ্ডীদাস যে প্রেমকে রূপ দিয়াছে, সুর দিয়াছে,—যে প্রেমের মূর্ত্তি গড়িয়াছে—তাহা বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার রূপ। অথচ তাহা বিশ্বজনমনলোভা, তাহা বিশ্বাতীত। এ প্রেমের স্বাধীনতা, এ প্রেমের তন্ময়তা—এ প্রেমের প্রকাশ যে জাতি করিতে পারিয়াছে,—সে জাতির অস্তিত্ব সহজে মুছিয়া ফেলিবার নহে।

"কেন, মেঘ দেখে রাই অমন হ'লি?" এই এক কথায় বাঙ্গলার একটা মস্ত বড় রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মেঘ,—ত আজিকার বাঙ্গালীও দেখে। কিন্তু মেঘের রূপে সেদিন বাঙ্গালী যাহার রূপ দেখিয়াছিল, আজ কি তাহা দেখিতে পায়? বাঙ্গালীর চক্ষে আজ আর রূপ ধরা দেয় না। বাঙ্গালী সভ্য হইয়াছে। অরূপের সন্ধানে ফিরিতেছে। এই মেঘের রূপ চণ্ডীদাস হইতে সেই "সজল জলদ অঙ্গ", কৃষ্ণকমল পর্য্যন্ত—৫০০ বৎসর বাঙ্গালীকে —"দিব্যোন্মাদে" তন্ময় করিয়া রাখিয়াছিল। ইহা বাঙ্গলার রূপ। সেরূপ কোথায় লুকাইল? বাঙ্গালী কিসে সে রূপ হারাইল? চণ্ডীদাসে ছিল রূপের আভাষ। শত বৎসর পরে নবদ্বীপে দেখা দিল সেই রূপের জীবন্ত বিগ্রহ।

আজু কেগো মুরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যামরায়॥
ইহার গৌর বরণে করে আলো।
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল?

মহাপ্রভুর জীবন বাঙ্গলার এক প্রচণ্ড রূপ। এত বড় রূপ বুঝি বাঙ্গলার সৃষ্টিতে আর নাই।

দেখিতে দেখিতে হরে, তনু মন চুরি করে,
নাচিনি এ কালা কিম্বা গোরা ॥

বাঙ্গালী শুধু রাধাকৃষ্ণের রূপে ফুটে নাই—শিব পার্ব্বতির রূপও বাঙ্গলাদেশ ধন্য করিয়াছে। স্রোতের ধারায় যেমন তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসে—, বাঙ্গলার স্রোতেও তেমনি রূপের পর রূপ আসিয়াছে। আবার একই ক্ষণে কত অপরূপ রূপের হাট বসিয়াছে। বাঙ্গলা যে রূপের প্রাণ। যার প্রাণে এত রস, এত রূপ ছিল—রূপবৈচিত্র্যে বিশ্বে যে ধন্য, আজ তাহাকে দেখিয়া কে বলিবে যে একদিন ইহার সত্যি রূপ ছিল। বিশ্বের রূপের হাটে দুর্ভাগা বাঙ্গালীর অদৃষ্ট লইয়া আজ পরিহাস করিতেও চক্ষু ভরিয়া অশ্রু আসে।

বাঙ্গালী শ্রীরাধিকার বিরহ মিলন গাহিয়াছে। সে অমর গীতি—অন্তরীক্ষ হইতে দেবতারা শুনিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার প্রাণ শুধু বৈষ্ণব নহে। বাঙ্গালী চণ্ডীর গানও গাহিয়াছে। কবিকঙ্কন, বাঙ্গলার কবি, বাঙ্গালীর কবি। বাঙ্গলার রূপের—এক মহাকবি। বাঙ্গলার রূপে ভালমন্দ দুই আছে। ভাড়ু দত্ত ও বাঙ্গলার একটা রূপ—কবি তাহাকেও রূপ দিয়াছেন।

তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীর রূপ—বিশেষ করিয়া ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের রূপ। ইহারাও বাঙ্গলার স্বরূপ জানিয়া বাঙ্গলার রূপের জন্ম দিয়া গিয়াছেন। সে রূপ দেখিতে দেখিতে বাঙ্গলা ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যায়, সে রূপে বিশ্ব কম্পিত হয়। সে ছন্দে সে ঝঙ্কারে—, সে সাধনা ও সিদ্ধিতে বাঙ্গালী আত্মরূপের পরিচয় পায়।

"মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে!
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলকল তরঙ্গা॥
ধকধ্বক্ ধক্ধ্বক্ জলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥

*　　*　　*

অদূরে মহারুদ্র ডাকে গম্ভীরে।
অরেরে অরে দক্ষ দেরে সতীরে॥

*　　*　　*

ইহাও বাঙ্গলার রূপ। মৃত সতী স্কন্ধে মহারুদ্রের সেই প্রচণ্ড তাণ্ডব—ইহাও বাঙ্গলার রূপ। পরমশৈব চাঁদ সদাগর হইতে ১৮দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই রূপ বাঙ্গলায় অক্ষুণ্ণ ছিল।

তারপর—রামপ্রসাদীরূপ। সেরূপের তুলনা কোথায়?

'কাল মেঘ উদয় হ'লো অন্তর অম্বরে।'

চণ্ডীদাসের সেই মেঘ,—রামপ্রসাদে রূপান্তরিত হইয়াছে। একি মেঘের কি বিচিত্র রূপ বাঙ্গালীর ধ্যানে মূর্ত্তি পাইয়াছে।

"কেরে, নবনীল জলধর কায়, হায়, হায়,
কেরে, হর হৃদি হৃদপদ্মে দিগবানে॥
কেরে নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মাণ করিল,
পদ রক্তোৎপল জিনি,
তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী?"

চণ্ডীদাসের কান্তভাব,—রামপ্রসাদের মাতৃভাব—এই দুই

ভাবই বাঙ্গলার নিজস্ব। দুইজনে দুই ভাবের ভাবুক—দুই রূপের পূজারী। আর এই দুই-ই—বাঙ্গলার রূপ।

কোন সুদূর অতীত যুগ হইতে ১৮দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গলার অফুরন্ত রূপের তরঙ্গ—সাহিত্যস্রোত আলোকিত করিয়া চলিয়াছে।

বাঙ্গালী কি এই রূপের ধ্যান করিবে না?

ফাল্গুন, ১৩২৮।

বাঙ্গালীর সহজিয়া সাহিত্য

"সহজ" ধর্ম্ম বলিয়া বাঙ্গলা দেশে একটা ধর্ম্ম ছিল এবং আছে। এই "সহজ" ধর্ম্মের একটা বিশেষ দার্শনিক মত আছে, এবং সেই মতের অনুরূপ সাধন-মার্গের ও নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই "সহজ" ধর্ম্মের দার্শনিক মতবাদ ও সাধন-পদ্ধতি লইয়া বাঙ্গলা দেশে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই বাঙ্গালীর সহজিয়া-সাহিত্য।

এখন স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উঠিবে যে, কোন্ সময়ে এই "সহজ" ধর্ম্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট সহজিয়া-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে?

কিছুদিন পূর্ব্বেও অনেকে বিশ্বাস করিয়াছেন যে, শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী মহাশয়ই এই 'সহজ' মতের প্রবর্ত্তক। "আনন্দ-ভৈরব" গ্রন্থে ইহার উল্লেখ ও প্রমাণ আছে। বাঙ্গলা দেশ এককালে বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, বীরভদ্র গোস্বামী মহাশয় অনেক পতিত বৌদ্ধকে "সহজ" মতের ভিতর দিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই সকল সহজিয়া-মতের বৈষ্ণবদিগকেই, সাধারণতঃ শাক্তমতাবলম্বিগণ 'নেড়ানেড়ীর দল' বলিত।

যদি এই ঘটনা সত্য হয়, তবে দেখা যাইতেছে যে, মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম্ম বাঙ্গলা দেশে প্রচারিত হইবার পরেও বাঙ্গলা দেশে এত অধিক বৌদ্ধ ছিল যে বীরভদ্র গোস্বামী মহাশয়ের সময়েও তাহাদিগকে বিশাল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার জন্য, এক

গুরুতর সামাজিক প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ—"সহজ" মতের আশ্রয় লইয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

"রঘুনন্দনেরও পরে বাঙ্গলা দেশে এত বৌদ্ধ ছিল যে, তাহাদের জন্য একখানি 'তন্ত্র' লেখাও আবশ্যক হইয়াছিল।" ইহার প্রমাণ আর কেহ নহে, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "না বাঙ্গলা, না সংস্কৃত" একখানি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া, আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন।

কাজেই অনুমান করা নিতান্ত অমূলক হইবে না যে, বাঙ্গলার বৌদ্ধ-শ্মশানের শেষ বহ্নি-শিখা খুব বেশী দিন নির্ব্বাপিত হয় নাই। বৈষ্ণব ও শাক্ত এ দুই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত, সাধন পদ্ধতি ও সাহিত্য অনুসন্ধান করিলে, বৌদ্ধশ্মশানের স্ফুলিঙ্গ এখনও বহুস্থানে দৃষ্টিগোচর হইতে পারে।

এই দিক্ দিয়া চিন্তা করিলে মনে হয় যে, বাঙ্গালীর সহজিয়া-সাহিত্য, "সহজ" ধর্ম্মের নানা পরিবর্ত্তন ও বিক্ষেপের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া, মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পরে শুধু বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শাখা-প্রশাখায় নয়, শাক্ত-সম্প্রদায়েরও বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় ছড়াইয়া রহিয়াছে। বৈষ্ণব ও শাক্তের শাখা-সম্প্রদায়গুলিকে ৺অক্ষয়কুমার দত্ত, তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়" গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলা সাহিত্যে এ বিষয়ে ৺অক্ষয়কুমারের চেষ্টাই প্রথম চেষ্টা। সুতরাং প্রথম চেষ্টায় সাধারণতঃ যে সকল ত্রুটি ও ভ্রম-প্রমাদ অনিবার্য্য, অক্ষয়কুমার তাহার হস্ত এড়াইতে পারেন নাই। এখন যদি কেহ

বাঙ্গলার বৈষ্ণব ও শাক্ত শাখাসম্প্রদায়গুলিকে, মত ও সাধনমার্গ এবং ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনের অগ্র-পশ্চাৎ-পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া পুনরায় আর একবার শ্রেণীবদ্ধ করিতে যত্ন করেন, তবে আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালীর সহজিয়া-সাহিত্যের শেষ অধ্যায় আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পাঠান ও মোগল আমলের বাঙ্গালী হিন্দুর সমাজ-জীবনের একটা লুপ্ত ইতিহাসও উদ্ধার হইবে।

কিন্তু ইহা ত গেল সহজিয়া-সাহিত্যের সর্ব্বশেষ অধ্যায়ের কথা। এই সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম অধ্যায় কোথায়?

মহাপ্রভুর পরে "সহজ"-ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, ইহা কি করিয়া বলা চলে? চণ্ডীদাসের গীতি-কাব্যে "সহজ"-ধর্ম্মের কথা স্পষ্টই উল্লেখ রহিয়াছে। তার পর "বাশুলী" আদেশে "রজকিনী রামী"কে লইয়া যে ধর্ম্মের সাধন চণ্ডীদাস করিলেন, তাহা হইতেও "সহজ"-ধর্ম্মের উৎপত্তি-বিবরণ ও লক্ষণের যথেষ্ট পরিচয় আমরা পাই।

"বাশুলী" দেবী, শুনা যাইতেছে হিন্দুদিগের নহে, বৌদ্ধদিগের দেবী। কাজেই সহজিয়া-সাহিত্যের উৎপত্তি-নিরূপণের জন্য বাঙ্গালী যে তাহার বৌদ্ধ-যুগে গিয়া উপনীত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর ব্রাহ্মণের সহিত রজকিনীর "সহজ"-ধর্ম্ম-সাধনা হিন্দুসমাজ যে নিরুপদ্রবে সহ্য করিয়াছিল, তাহাও নহে। এই "সহজ"-ধর্ম্মসাধনায় বর্ণাশ্রম ও জাতিধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে একটা স্পষ্ট বিদ্রোহ আছে, তাহা সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

সুতরাং চণ্ডিদাসের কাব্যকে সহজিয়া-সাহিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার যথেষ্টই কারণ আছে।

এই চণ্ডিদাসের কাব্য মহাপ্রভু পরম আনন্দে পাঠ করিতেন ও শুনিতেন। চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং মহাপ্রভু স্বয়ং যে এই "সহজ"-ধর্ম্ম যাজন করেন নাই, তাই বা কে সাহস করিয়া বলিবে? এমন কিম্বদন্তিও আছে যে মীরাবাই নাকি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ প্রভৃতি ছয় গোস্বামীর সহিত 'সহজ' ধর্ম্মসাধন করিয়াছিলেন। এই 'সহজ' ধর্ম্মই বৈষ্ণবের 'পরকীয়া' সাধনে রূপান্তরিত হয়। বৈষ্ণব-যুগ অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালীর বৌদ্ধযুগের যে সাহিত্য পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৩২৩ সালে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মূলতঃ সহজিয়া-সাহিত্য। এই সমস্ত বৌদ্ধ গান ও দোহাতে সহজ-ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধনমার্গ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। এবং তাহার মধ্যে বাঙ্গলার একটা রূপেরও আভাস পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকগণ আর আজ নাই। কাজেই সে গোপনীয় সাধন-রহস্যের সব কথা আজ কে ব্যক্ত করিবে? সে রূপ কে ফুটাইয়া দেখাইবে?

বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বের বাঙ্গলা সাহিত্য আছে কি না, এবং থাকিলেও তাহা কিরূপ এবং কোথায় আছে, কোন বাঙ্গালীই তাহা জানে না। আমাদের বিশ্বাস, 'সহজ'-ধর্ম্ম বলিয়া একটা ধর্ম্মমত ও তাহার অঙ্গীয় সাধনা বৌদ্ধ-যুগের পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালা দেশে ছিল। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব যুগের সহজিয়া সাহিত্য আমরা কিছু কিছু পাইতেছি। অন্যান্য যুগের সহজিয়া-সাহিত্য

এখনও অনাবিষ্কৃতই রহিয়াছে। এই সমস্ত অৰ্দ্ধ আবরণমুক্ত ও বহু পরিমাণে অনাবিষ্কৃত সাহিত্যের মধ্যে বাঙ্গলার একটা রূপ আবৃত রহিয়াছে।

সবুজ পত্রের সম্পাদক "বাঙলা কি পড়্ব?" প্রবন্ধে বলিতেছেন যে, "শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগৃহীত পদাবলী।

—সম্ভবতঃ (?) হিন্দুযুগেই রচিত হয়েছিল।"

—আর "এ গান ও এ শ্লোকের ভাষা বাঙলা কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

—আর "গৌড়ের তক্তের মালিক যখন বাদশা, বাঙলা সাহিত্য সেই সময়ে জন্মলাভ করে।"

সুতরাং পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে "বৌদ্ধ গান ও দোহাকে",—"হাজার বছরের পুরাণ বাঙলা ভাষা" বলিয়া প্রচার করিতেছেন, সম্পাদক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী বস্তুতঃ তাহা বাঙলা ভাষা কিনা, সে বিষয়ে, একটু আধটু নয়, যথেষ্ট সন্দেহ করিতেছেন। প্রমথ বাবুর মতে মুসলমান-বিজয়ের পরে বাঙ্গলা সাহিত্য ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

অন্য পক্ষে পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র ভূমিকার শেষে বলিতেছেন,—

—"মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে একটা প্রবল বাঙ্গলা সাহিত্যের উদয় হইয়াছিল। তাহার একটি ভগ্নাংশমাত্র আমি বাঙ্গালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করিতেছি। ভরসা করি, তাঁহারা যেমন উদ্যম সহকারে বৈষ্ণব-সাহিত্য ও অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার করিয়াছেন, ঐরূপ উৎসাহে বৌদ্ধ ও

নাথ-সাহিত্যের উদ্ধার-সাধন করিবেন। ইহার জন্ম তাঁহাদিগকে তিব্বতী ভাষা শিখিতে হইবে, তিব্বত ও নেপাল বেড়াইতে হইবে, কোচবিহার, ময়ূরভঞ্জ, মণিপুর সিলেট প্রভৃতি প্রান্তবর্ত্তী দেশে ও প্রান্তরভাগে ঘুরিয়া গীতি-গাথা ও দোহা সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাতে অনেক পরিশ্রম করিতে হইবে, অনেকবার হতাশ হইয়া ফিরিতে হইবে। কিন্তু যদি সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, যাঁহারা এ পর্য্যন্ত কেবল আপনাদের কলঙ্কের কথাই কহিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা একেবারেই সত্য কথা কহেন নাই।"

সবুজপত্র-সম্পাদক মহাশয় তিব্বতী ভাষা শিখিয়া নেপালেও বেড়ান নাই, আর অন্যান্য যেরূপ পরিশ্রমের কথা শাস্ত্রী মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও করেন নাই, কেবলমাত্র তিনি "যথেষ্ট সন্দেহ" করিয়াছেন। আমরা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি, কেন ?

"অগ্রহায়ণ" সংখ্যার "প্রতিভা"তে শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ "বৌদ্ধ-সহজিয়া সাহিত্য" প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগৃহীত "বৌদ্ধগান ও দোহা" সম্বন্ধে অনেক সঙ্গত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—

—বেদের মধ্যে ও উপনিষদ সাহিত্যের স্থানে স্থানে "সহজ" তত্ত্বের বীজ আছে।

—বজ্রযান সম্প্রদায় হইতে বৌদ্ধ এবং হিন্দু উভয় সম্প্রদায়েই "সহজ-তত্ত্ব" গৃহীত হইয়াছিল।

—গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতেই এই মত (সহজিয়া মত) গৌড়-বঙ্গে প্রচলিত ছিল।

—'বৌদ্ধগান ও দোহা'ই উত্তর-যুগের বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যের জন্মদাতা।

হাজার বছরের পুরান বাঙ্গলা ভাষা অবশ্য বীরবলী ঢংএ রচিত হয় নাই। সেই প্রাচীনকালের ভাষার গঠন যেরূপ হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল, তাহাই হইয়াছে।

আলোচ্য "বৌদ্ধগান ও দোহা"গুলিকে আমরা বর্ত্তমান বাঙ্গালীর সহজিয়া-সাহিত্যের প্রথম অধ্যায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। বাঙ্গালীর "সহজ"-ধর্ম্ম ও সহজিয়া-সাহিত্যের আরও আলোচনা হওয়া আবশ্যক। কেন না, ইহা বাঙ্গালীর একেবারে 'ঘরো' সাহিত্য। আর আমরা বাঙ্গালীর 'ঘরো' সাহিত্য আলোচনার একান্ত পক্ষপাতী। কেন না, বাঙ্গলার একটা রূপ এই 'ঘরো' সাহিত্যের মধ্যেই লুকায়িত রহিয়াছে।

মাঘ, ১৩২৫ সাল।

বাঙ্গলা মাসিকে শ্রীকবিকঙ্কণ

—'কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'সবুজপত্রে,'—'সম্পাদক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী' 'বাঙলা কি পড়্ব ?' শীর্ষক প্রবন্ধে কবিকঙ্কণ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

'পৌষে'র 'প্রবাসী'তে—বঙ্গের 'পাঁচালি-সাহিত্য' প্রবন্ধে, শ্রীরাধাবল্লভ নাগ মহাশয়ও কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যের আলোচনা, প্রসঙ্গতঃ আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন।

ইংরেজ আমলের পূর্ব্বের বাঙ্গলা-সাহিত্য সম্বন্ধে যে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী ক্রমশঃ সচেতন হইতেছেন,—ইহা দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেছি; এবং এই সম্পর্কে আমাদের যৎকিঞ্চিৎ পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিতেছি।

মুকুন্দরামের "চণ্ডী" সম্বন্ধে সবুজপত্র-সম্পাদক এই মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন,—"চণ্ডী'র বিশেষত্ব এই যে, এ হচ্ছে খাঁটি বাঙলা কাব্য। আজকাল দেখ্তে পাই, এক দল লোক খাঁটি বাঙালীর সন্ধানে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের রাজ্যে হাঁৎড়ে বেড়াচ্ছেন। ও-জীবটিকে আন্‌কোরা অবস্থায় যদি কোথাও আবিষ্কার করা যায়, ত সে হচ্ছে চণ্ডীর উপাখ্যান ও মনসার উপাখ্যানের মধ্যে।" "ও-জীবটির" অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সবুজপত্র-সম্পাদকের একটা সংবিৎ আছে,—ইহা শ্রবণ করিয়া আমাদের চিত্তে, এমন কি আশার সঞ্চার হইয়াছে।

'পাঁচালি-সাহিত্যে'র লেখক বলেন—"কবিকঙ্কণের চণ্ডীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাঁচালি। * * * কবিকঙ্কণ একেবারে খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। * * * কবিকঙ্কণের পাঁচালিতে বাংলাদেশ এবং বাঙালী যেরূপ তাহার পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, ভবিষ্যতের বাংলা-সাহিত্য সেইরূপ আদর্শেই গঠিত হইবে।"

'সবুজপত্র' ও 'প্রবাসী'র দুই জন আধুনিক কৃতবিদ্য সমালোচক একসঙ্গে সিদ্ধান্ত করিলেন যে—

—কবিকঙ্কণ একজন 'খাঁটি বাঙ্গালী'।

—কবিকঙ্কণের "চণ্ডী" একেবারে 'খাঁটি বাঙ্গলা কাব্য'।

সুতরাং বুঝিতে হইবে বাঙ্গলার একটা রূপ এই কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আশ্বাসের কথা বটে। এই সিদ্ধান্তে যথেষ্ট সত্য আছে, কিন্তু অতি সামান্যমাত্রও মৌলিকত্ব নাই। শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু ও রামগতি ন্যায়রত্ন, ইঁহারা দুই জনে কবিকঙ্কণের কবি-প্রতিভাকে যে সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছেন। 'সবুজপত্র' ও 'প্রবাসী'র লেখকদ্বয় এই সমস্ত পূর্ব্বগামীদের মৌলিক সমালোচনা যদি আরও অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এই সমালোচনা সম্ভবতঃ এত তরল হইত না। তাঁহারা যদি স্পষ্ট করিয়া বলিতেন যে, কোথায় তাঁহাদের মত পূর্ব্বগামীদের অনুসরণ করিতেছে আর কোথায়ই বা তাঁহারা পূর্ব্বগামীদের পন্থা ছাড়িয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র পথ আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছেন,—তাহা হইলে সমালোচনা-পদ্ধতির একটা পারম্পর্য্য

রক্ষিত হইত,—এবং এই সমস্ত সমালোচনা বস্তুতঃই সমালোচনা-সাহিত্যে স্থান পাইতে পারিত।

জানি না, এই লেখকদ্বয় কবিকঙ্কণ-সমালোচনায় কোনরূপ মৌলিকত্ব দাবী করিতেছেন কি না। যদি তাহা না করেন, তবে পূর্ব্বগামী সমালোচকদের প্রসঙ্গমাত্র উত্থাপন করিলেন না কেন? অথচ কবিকঙ্কণ সম্বন্ধে—মূল সিদ্ধান্তে ইঁহারা এমন কিছুই বলেন নাই, যাহা রাজনারায়ণ বাবু ও রামগতি ন্যায়রত্নের এক অতি ক্ষীণ ও অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি ভিন্ন আর কিছু।

'পাঁচালি-সাহিত্যে'র লেখকের প্রতি আমাদের রূঢ় হইবার কোন কারণ নাই। তবে একটি কথা বলিবার আছে। তিনি 'খাঁটি বাঙ্গলা কাব্যে'র বিষয় বলিতে গিয়া চারি ছত্রের মধ্যে 'বাঙ্গালী' ও 'বাঙ্গলা'—এই শব্দ দুইটির কোনরূপ খাঁটি বানান দিতে পারেন নাই। একবার লিখিয়াছেন, 'বাঙ্গালী', আবার লিখিয়াছেন, 'বাঙালী'; একবার লিখিয়াছেন 'বাঙ্গলা', আবার লিখিয়াছেন—'বাংলা'। অথচ মাত্র চারিটি ছত্রের মধ্যে এই বানান-সঙ্কটে তিনি পতিত হইয়াছেন। ইতস্ততঃ না করিয়া একটা বানানের দিকে পড়িয়া থাকাই ত ভাল। কেননা, অব্যভিচারিণী যে নিষ্ঠা, তাহার প্রশংসা সকলেই করে।

'পাঁচালি সাহিত্যে'র লেখকের লেখায় কোন অশিষ্ট ভাব নাই। বরং তিনি একটা শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব লইয়াই কবিকঙ্কণের সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু 'সবুজপত্র সম্পাদকে'র সমালোচনার নমুনা এইরূপ,—'চণ্ডীর' উপাখ্যান সাহিত্য কি না, আর যদি তা সাহিত্যও হয়, ত তা কাব্য কি

না? আমার মতে ও-গ্রন্থ সাহিত্যও বটে, কাব্যও বটে। কবিকঙ্কণ উঁচুদরের কবি না হলেও কবি।" সবুজপত্রের সম্পাদকের মনে হয় ত কোন অশিষ্টভাব ছিল না; কিন্তু বলিবার যে বিশেষ ভঙ্গী তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে অশিষ্ট ভাব সম্ভবতঃ তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

সবুজপত্র-সম্পাদকের সমালোচনার ভঙ্গীতে এমনি এক মুরুব্বীয়ানা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বাবু প্রভৃতির সমালোচনায় আমরা পাই না; এবং সবুজপত্র সম্পাদক মহাশয় নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন যে, সাহিত্য-সমালোচনায় রাজনারায়ণ বসু, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি তাঁহার অপেক্ষা অনেক মুরুব্বী ব্যক্তি। কবিকঙ্কণের কাব্য আলোচনায় যে মুরুব্বীয়ানা-ভাব দেখাইতে রাজনারায়ণ বসু, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি সাহিত্য-রথিগণ স্বভাবতই সঙ্কোচবোধ করিয়াছেন, সেই খামাখা মুরুব্বীয়ানা সবুজপত্র-সম্পাদক অসঙ্কোচে, অক্লেশে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে সাহিত্য-সমালোচনার একটা সম্ভ্রম নষ্ট হয়, সাহিত্যিকদিগের একটা মর্য্যাদা-হানি হয়। সুতরাং আমরা 'বীরবলী' ভঙ্গীর নাহক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যপূর্ণ সমালোচনার বিরোধী।

সবুজপত্র-সম্পাদক লিখিয়াছেন, 'চণ্ডী যে কোন্ অভিধানের সাহায্যে পড়্তে হয়, তার সন্ধান নিতে হ'লে 'সাহিত্য-পরিষদ' এর দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অথচ সে পরিষদে শিলালিপির অভিধান পাওয়া যেতে পারে, বাঙলার পাওয়া যাবে না।" সুতরাং তাঁহার কথা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তিনি উপযুক্ত অভিধানের অভাবে কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী' এখনও

ভালরূপ অধ্যয়ন করিতে পারেন নাই। কবিকঙ্কণের সকল সংস্করণগুলির সহিত তাঁহার পরিচয় আছে কি না, তাহাও পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে না। কেন না, এমন সংস্করণও আছে—যাহাতে অপ্রচলিত ও প্রাচীন শব্দের অর্থ দেওয়া আছে, এবং অভিধান ছাড়াও তাহার অধ্যয়ন চলিতে পারে।

মাঘ, ১৩২৫ সাল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলা সাহিত্য

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র ইতিহাস-লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাঙ্গলা সাহিত্য "নৈতিক আদালতের বেত্রঘাত যোগ্য।" "শুধু কঠোর সমালোচনা" (?) যথেষ্ট নয়। তখনকার সাহিত্যে "বর্ণিত নারী চরিত্রগুলিতে হীন প্রবৃত্তির অসভ্য উল্লাস দৃষ্ট হয়।" আর দীনেশ বাবু বলিয়াছেন, "সাহিত্যেই সমাজ প্রতিফলিত হইয়া থাকে।"

—"দেবদেবীগণ যখন এই ভাবে পাপের আবরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে মহাপুরুষ রামমোহনের আগমনের সময় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।"

'ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দরের আদর্শে'—'চন্দ্রকান্ত', 'কামিনীকুমার' ও 'জীবনতারা';—'এই কাব্যত্রয়' রচিত হইয়াছিল। আর "এই তিনখানি কাব্যেই কালী নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে।"

কথাটা বিশ্লেষণ করিলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অত্যন্ত ব্যভিচার চলিতেছিল। সমাজের এই ব্যভিচার বা পাপ সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। 'কালী' নামধেয়া জনৈকা দেবীর 'আবরণ' দিয়া, সমাজে ও সাহিত্যে এই পাপ প্রশ্রয় পাইতেছিল। কাজেই এই "পাপের আবরণ-স্বরূপ" যে "দেবদেবীগণ," তাহার উচ্ছেদসাধন আবশ্যক হইয়া পড়িল এবং কাজেই রাজা রামমোহন অবতীর্ণ হইয়া "পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা" করিলেন।

বাঙ্গলাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ও শাক্ত এই দুই সম্প্রদায়ই ছিল। এই দুই সম্প্রদায়েরই সমাজ ছিল, সাহিত্য ছিল, এবং দেবদেবী ছিল। রাধাকৃষ্ণের মধুর ভাব, ও চৈতন্য মহাপ্রভু ও তদীয় পারিষদবর্গদের লইয়া বৈষ্ণব-সমাজে যে সাহিত্য তখন প্রচলিত ছিল, তাহাই বাঙ্গালীর সে যুগের বৈষ্ণব-সাহিত্য। আর শিব-শক্তি ও বিশেষভাবে কালীদেবীর মাতৃভাব লইয়া শক্তি-উপাসক-সমাজে যে সাহিত্য তখন প্রচলিত ছিল, তাহাই বাঙ্গালীর সে যুগের শাক্ত-সাহিত্য। শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবু 'ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দরের আদর্শে' যে কাব্যত্রয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক খানিতেই "কালীনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে" বলিয়াছেন; এবং এই কালীনামের আবরণের অন্তরালে পাপের প্রস্রবণ অবাধে ছুটিতে দেখিয়া, রামমোহনের আগমনের সময় হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং রামমোহন কর্ত্তৃক "পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা" সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু রামমোহনের পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যের অশ্লীলতার প্রসঙ্গ তিনি একবারও উল্লেখ করেন নাই। বৈষ্ণব-সাহিত্যকে তিনি তাঁহার 'নৈতিক আদালতে' কেন হাজির করিলেন না, বুঝিতে পারিতেছি না। বৈষ্ণব-সাহিত্যে কি বৈষ্ণব-সমাজের 'পাপ' সম্যক্ প্রতি-ফলিত হয় নাই? অথবা বৈষ্ণব-সমাজে পাপ ছিল না? অথবা বৈষ্ণব 'দেবদেবীগণ পাপের আবরণ' হইতে বিরত ছিলেন?

শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবু 'দেবদেবীর পাপের আবরণে'র প্রসঙ্গে শাক্ত-সাহিত্যকে 'বেত্রাঘাত' করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যকে তাঁহার 'নৈতিক আদালতে' হাজির করেন নাই। 'কালী'কে

পাপের আবরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, 'রাধাকৃষ্ণ'কে কৃপা-পূর্ব্বক ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু এখানে একটা অতি বড় রকমের অসঙ্গতি দেখিতেছি। শ্রদ্ধেয় দীনেশ 'বাবু ১৮শ শতাব্দীর শাক্ত-সাহিত্য নিঙড়াইয়া যে 'পাপ' বাহির করিয়া দেখাইতেছেন যে, শাক্ত সম্প্রদায়ের এই সামাজিক দুর্নীতি দূর করিবার জন্যই রাজা রামমোহন আগমন করিয়াছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় রাজা রামমোহন শাক্ত উপাসকমণ্ডলীর সেই দুর্নীতি বা পাপকে শাস্ত্রীয় প্রতিপন্ন করিয়া সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

—আর বাঙ্গালীর যে বৈষ্ণব-সাহিত্যকে—দীনেশ বাবু কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহার নৈতিক আদালতে উপস্থিত করেন নাই, রাজা রামমোহন খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই বৈষ্ণব দেবদেবী, বৈষ্ণব সমাজ ও বৈষ্ণব সাহিত্যের পাপকেই বিশেষভাবে আক্রমণ করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গলার হিন্দুসমাজ বাঙ্গালীর স্মৃতির আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াই চলিয়া আসিতেছে। রঘুনন্দনের পরে বাঙ্গলার স্মৃতির সংস্কার অতি অল্প লোকেই করিয়াছেন। বাঙ্গলার সমাজ-সংস্কার, বাঙ্গলার স্মৃতির সংস্কার ব্যতিরেকে হইতে পারে না। কাজেই রঘুনন্দনের পরে বাঙ্গলার হিন্দুসমাজে কোন সংস্কার হইয়াছে বলিয়া বাঙ্গালী হিন্দু স্বীকার করিবে না। বাঙ্গলায় আবার দ্বিতীয় রঘুনন্দনের জন্ম না হইলে, বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজ কোন সংস্কারকেই গ্রহণ করিবে না। বাঙ্গালী সমাজে—শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুইটি বিশেষ সাধন-সম্প্রদায় আছে। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমের লোকও আছে এবং গার্হস্থ্যাশ্রমের বাহিরে

অন্যান্য আশ্রমের লোকও আছে। গার্হস্থ্যাশ্রমের বাহিরে যে সমস্ত সাধকেরা আছেন, তাঁহারা অনেক স্থলে স্মৃতির আদেশ অমান্য করিয়া চলেন, এরূপ দেখা যায়। শাক্ত সম্প্রদায়েও দেখা যায়, বৈষ্ণব সম্প্রদায়েও দেখা যায়। বৈষ্ণব ও শাক্তদের মধ্যে অনেক শাখা-সম্প্রদায় আছে। এই উভয় সম্প্রদায়ের সাধকদের মধ্যে অনেকেই আমৃত্যু ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বা বাণপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসাশ্রমে জীবন অতিবাহিত করেন। আবার অনেক বৈষ্ণব যেমন গৃহত্যাগ করিয়াও সেবাদাসী গ্রহণ করেন, তেমনি অনেক শাক্ত গৃহত্যাগ করিয়া সাধন-ভজনের প্রয়োজনের জন্যই ভৈরবী বা শক্তি গ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্বে বৌদ্ধ-যুগেও সিদ্ধাচার্য্যগণ, শক্তি গ্রহণ করিতেন এমন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বৈষ্ণবের সেবাদাসী-গ্রহণ এবং শাক্তের শক্তি-গ্রহণ প্রসঙ্গেই এ যুগের নীতিবিদ্‌গণ হুঙ্কার দিয়া উঠেন, বলেন,—এ কি, দেবদেবীর আবরণে একি পাপের প্রশ্রয়, ইত্যাদি। এবং দেবদেবীর আবরণে যদি কোন পাপ প্রশ্রয় পাইয়া থাকে, তবে তাহাও এই শ্রেণীর পাপ। ইহার অতিরিক্ত অন্য কোন নূতন উপায়ে উদ্ভাবিত নূতন রকমের পাপ ১৮শ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সাহিত্য হইতে কেহ আবিষ্কার করিয়াছেন কিনা আমরা জানি না।

যাহা হউক, রাজা রামমোহন ত কালীদেবীর আবরণের অন্তরালে পাপ দূর করিবার জন্য আগমন করিলেন। কিন্তু তিনি আগমন করিয়া এই কথা বলিলেন যে,—"শৈব বিবাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই। কেবল সপিণ্ডা না হয়। তাহাকে শিবের আজ্ঞাবলে শক্তিরূপে গ্রহণ করিবে।"

—"শৈব বিবাহের দ্বারা বিবাহিতা যে স্ত্রী, সে বৈদিক বিবাহের ন্যায় অবশ্য গম্যা হয়।"

—তবে মদ্যপান সম্বন্ধে কুলবধূরা মাত্র আঘ্রাণ করিবে। "আর গৃহস্থ সাধকেরা পঞ্চপাত্রের অধিক গ্রহণ করিবে না। পাঁচ তোলার অধিক পানপাত্র করিবে না। মন্ত্রার্থের স্ফূর্ত্তি হইবার উদ্দেশে এবং ব্রহ্মজ্ঞানের স্থিরতার উদ্দেশে মদ্যপান করিবে।"

'শিবের আজ্ঞাবলে' যে কোন জাতির যে কোন বয়সের স্ত্রীলোককে 'শক্তিরূপে গ্রহণ' করা যায়; এবং বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর ন্যায় উক্ত তন্ত্রোক্ত বিবাহের স্ত্রীও গম্যা হয়। তবে গৃহী সাধকেরা যেন পান বিষয়ে পঞ্চ পাত্রের অধিক গ্রহণ না করেন।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রের অনুকারী রাজা রামমোহনের বাক্য উদ্ধার করিলাম।

দীনেশ বাবু বলিয়াছেন যে, কালী নামের অন্তরালে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজে ও সাহিত্যে 'পাপ' প্রশ্রয় পাইয়াছে। 'দেবদেবীগণ পাপের আবরণ' হওয়াতেই রামমোহনের আগমন ও "পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম-ঘোষণার,"—এক কথায় ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুত্থানের প্রয়োজন হইয়াছিল।

আমরা রামমোহনের বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইলাম যে তিনি—

দীনেশ বাবু কথিত পাপের আবরণস্বরূপ দেবদেবীগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন সত্য;—

—কিন্তু সেই আবরণের অন্তরালে, দীনেশ বাবু যাহাকে 'পাপ' বলিয়াছেন, রামমোহন সেই আবরণের দোহাই দিয়া, সেই দীনেশ

বাবু-কথিত পাপকেই শাস্ত্রীয় বলিয়া সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। কে বলিবে, দেবদেবীর আবরণযুক্ত অথবা আবরণমুক্ত এই "পাপের" সমর্থনের মধ্যেই রাজা রামমোহনের এক নিগূঢ় সমাজসংস্কার প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে কি না?

—যদি দীনেশ বাবু জাতি ও বয়সনির্ব্বিশেষে কোন স্ত্রীলোককে শিবের আজ্ঞাবলে শক্তিরূপে গ্রহণ করা অশাস্ত্রীয় মনে করেন ও তন্ত্রোক্ত, উক্ত স্ত্রীতে গমন করা 'পাপ' বা ব্যভিচার, বা অশ্লীলতা মনে করিয়া সঙ্কুচিত হন, তবে, রামমোহন, যাহাকে দীনেশ বাবু 'মহাপুরুষ' বলিয়াছেন, সেই মহাপুরুষ রামমোহন তাঁহাকে সাহস দিয়া এইরূপ বলিতেছেন,—"বৈদিক বিবাহের স্ত্রী জন্ম হইবা-মাত্রেই পত্নী হইয়া সঙ্গে স্থিতি করে, এমত নহে। বরঞ্চ দেখিতেছি, যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ কল্য ছিল না, সেই স্ত্রী যদি ব্রহ্মার কথিত মন্ত্রবলে শরীরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী অদ্য হয়, তবে মহাদেবের প্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা গৃহীতা যে স্ত্রী, সে পত্নীরূপে গ্রাহ্য কেন না হয়?" —"শিবের শাস্ত্রের অমান্য যাঁহারা করেন, সকল শাস্ত্রকে এককালে উচ্ছন্ন তাঁহারা করিতে পারগ হয়েন, এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্রগ্রহণ ও অনুষ্ঠান তাঁহাদের বৃথা হইয়া পরমার্থে তাঁহাদের সর্ব্বথা বিফল হয়।"

দীনেশ বাবু তাঁহার "পরমার্থ"—বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন একথা কে বলিতে সাহস করিবে?

এই প্রসঙ্গে দীনেশ বাবুর আর একটি মন্তব্য সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি আছে। দীনেশ বাবু—

—রামপ্রসাদ ও রামমোহনের মূর্ত্তিপূজার অনাবশ্যকতা-প্রতি-

পাদক গানগুলি পাশাপাশি স্থাপন করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, পৌত্তলিকতার সহিত সংগ্রাম-ঘোষণায় রামপ্রসাদ রামমোহনের পূর্ব্বগামী।

—প্রসাদী সঙ্গীত ও রামমোহনী ব্রহ্মসঙ্গীত একই পর্য্যায়ভুক্ত। বাঙ্গালীর গানের ধারায় তাহা অবিচ্ছিন্ন।

আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই হয় যে,—রামপ্রসাদ কখনই মূর্ত্তিপূজা অস্বীকার করেন নাই। রামপ্রসাদের ধর্ম্ম আর রামমোহনের ধর্ম্ম এক বস্তু নহে। বিশেষরূপে স্বতন্ত্র বস্তু।

—সাহিত্য ও কলাকলার বিচারে প্রসাদী সঙ্গীত ও রামমোহনী ব্রহ্মসঙ্গীত একই পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। "রামপ্রসাদের কণ্ঠে যে গানের অবসান হইয়াছিল," তাহা "রামমোহনের কণ্ঠে উত্থিত" হয় নাই। তাহা উত্থিত হইয়াছিল কমলাকান্ত, নরেশচন্দ্র প্রভৃতি আরও অনেক কবির কণ্ঠে। কি কলাকলার দিক্ দিয়া, কি বাঙ্গালীর মাতৃভাবের সাধনার দিক্ দিয়া, এবং বিশেষভাবে কি মূর্ত্তি-পূজার দিক্ দিয়া, প্রসাদী সঙ্গীত ও রামমোহনী ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে একটা সমুদ্রের ব্যবধান রহিয়াছে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর দুইটি স্পষ্ট বিভিন্ন যুগের ব্যবচ্ছেদ দীনেশ বাবুর দৃষ্টিকে, জানি না কেন, এড়াইয়া গিয়াছে।

রামপ্রসাদ শুধু বাঙ্গলার নয়, জগতের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ সাধক। রামমোহনও তাঁহার সময়ে পৃথিবীর একজন বরেণ্য পণ্ডিত, পণ্ডিতদের মধ্যে আবার সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। স্বাতন্ত্র্য-গৌরবে সমুজ্জ্বল, একে অন্য হইতে বহু অংশে পৃথক্, এই দুইটি পাহাড়-পর্ব্বতের সমালোচনা আরো ধীরভাবে করা সঙ্গত।

—জগতের সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মবিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠাতার ধর্ম্ম, এবং বাঙ্গলার শেষ, অথচ বিশ্ববরেণ্য—একজন কবি ও সাধকের কাব্য ও সাধনা, পাশাপাশি আলোচনা করিতে আমরাও উৎসাহী।

কিন্তু আমাদের এক প্রশ্ন এই যে,—"চন্দ্রকান্ত", "কামিনী-কুমার," ও জীবনতারার" জন্যই যদি রামমোহনের এত প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে রামপ্রসাদের প্রসাদী সঙ্গীতের পরে, রাম-প্রসাদের মূর্ত্তিসাধনার ভিতর দিয়া সিদ্ধি ও সমাধি করতলগত হইবার পরে, রামমোহনের "পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম" করিবার কোন্ প্রয়োজন ছিল? কালী যে 'পাপের আবরণ' না হইয়াও সাধককে সিদ্ধির শ্রেষ্ঠতম সোপানে তুলিয়া ধরিতে পারেন, তাহা ত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালী রামপ্রসাদ দেখাইয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদের মূর্ত্তিপূজায় অমূর্ত্ত বাধা পায় নাই, 'ত্রিভুবনও মায়ের মূর্ত্তি' হইয়াছে, "তারা আমার নিরাকারা" ও হইয়াছে,—আবার চক্ষু মুদিলে অন্তরেতে 'মুণ্ডমালী'রূপে দেখা দিয়াছে। মা যে 'তনয়ারূপেতে বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া,' সে কথা যখন কেহ বিশ্বাস করেন না, তখন না হয় নাই বলিলাম। রামপ্রসাদ ধর্ম্মসাধনায় কোন হেজী-পেঁজী সাধক নহেন, রাম-প্রসাদের সাধনায় কালী 'পাপের আবরণ' হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এ কথা কি দীনেশ বাবুও বলিতে সাহস করিবেন? অথচ এই রামপ্রসাদও প্রথম জীবনে বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছিলেন। কি করিয়া বিদ্যাসুন্দরের কবি জগতের একজন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসঙ্গীত রচয়িতা হইতে পারেন, কি করিয়া মূর্ত্তির উপাসক একজন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাধক হইতে পারিয়াছিলেন, আর বিশেষতঃ রামমোহন আগমনের

অব্যবহিত পূর্ব্বে, তাহা স্থির হইয়া চিন্তা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, রামমোহনের আগমনের প্রাক্কালে, দেবদেবীচরিত্র, বাঙ্গলার নারীচরিত্র, বাঙ্গালীর সমাজ ও সাহিত্য যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাংশেই সত্য বর্ণনা নহে।

রাজা রামমোহনের কথাতেই বলিতে হয় যে, "সুবোধ নির্ব্বোধ সর্ব্বকালে হইয়া আসিতেছে।" অর্থাৎ অধার্ম্মিক ও দুষ্টস্বভাবের লোক রামমোহনের পূর্ব্বেও হইয়া আসিয়াছে এবং পরেও হইয়া আসিতেছে।

রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম্ম অভ্যুত্থানের যে নৈতিক কারণ আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিলাম, তাহা যে সর্ব্বাংশেই সত্য নহে, এ কথা সম্ভবতঃ সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। আর যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, তবে একজন প্রবীণ ও ভক্তিভাজন ব্রাহ্ম 'একাল ও সেকাল' আলোচনা করিতে গিয়া, চরিত্রগত ও সামাজিক পাপসম্বন্ধে সেকাল হইতে একালকেই অধিকতর দোষী সাব্যস্ত করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধার করিতেছি। এই 'একাল' কবে? নিশ্চয়ই রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম্মের পরে। আর এই 'সেকাল' কবে? হয় রামমোহনের সময়ে অথবা তাঁহার পূর্ব্বে। শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বাবু লিখিতেছেন—"এক্ষণকার লোক পানাসক্ত ও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেশ্যাসক্ত। * * * যেমন পানদোষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনি বেশ্যাগমনও বৃদ্ধি পাইতেছে। সে কালে লোকে প্রকাশ্যরূপে বেশ্যা রাখিত। বেশ্যা রাখা বাবুগিরির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। এক্ষণে তাহা প্রচ্ছন্ন-ভাব ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সেই প্রচ্ছন্নভাবে তাহা বিলক্ষণ বৃদ্ধি

পাইতেছে। বেশ্যাগমন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার প্রমাণ বেশ্যাসংখ্যার বৃদ্ধি।"

দেবদেবীর আবরণ মুক্ত হইয়া সমাজ আজ সত্যই কোন পথে চলিতেছে? ইহা কিসের সংস্কার? আবরণের, না পাপের?

ফাল্গুন, ১৩২৬ সাল।

বাঙ্গালীর সাহিত্য

স্ববিরোধিতা

জ্যৈষ্ঠের "প্রবাসী"—শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের —"স্বদেশী সাহিত্য" নামক প্রবন্ধটীকে প্রথম স্থান দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। নলিনী বাবুর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধগুলি আমরা সর্ব্বদাই মনযোগের সহিত পাঠ করিয়া থাকি। আলোচ্য প্রবন্ধটিও আমরা বহুবার পাঠ করিয়াছি। তথাপি প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য মূল এবং শাখামতগুলির সহিত একমত হইতে না পারিয়া—নলিনী বাবুর উপর যে সামান্য উপদ্রব করিতেছি,—রাজা রামমোহনের ভাষায় বলিতে গেলে—"তজ্জন্য মনস্তাপবিশিষ্ট"।

আমাকে প্রথমেই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, নলিনী বাবুর প্রবন্ধটি স্পষ্ট স্ববিরোধিতা-দোষে দুষ্ট। যদি এই স্ববিরোধী দোষ খুব স্পষ্ট না হইত, তাহা হইলে আমি তাহার উল্লেখ করিতে স্বভাবতঃই ইতস্ততঃ করিতাম।

নলিনী বাবু 'প্রবাসীর' ৯৮ পৃঃ লিখিতেছেন,—"ইংরেজ যদি না আসিত, কোন বিদেশীর ছায়াই যদি বাঙ্গলার প্রাণকে না ঢাকিয়া ফেলিত, তবুও আমরা যে আজ কেবল বিদ্যাপতি চণ্ডিদাসকেই বসিয়া বসিয়া সৃজন করিতাম, ইহাও মস্ত ভুল। তখনও বাঙ্গলা যদি সজীব থাকিত, তবে সমস্ত জগতে যে হাওয়া বহিতেছে, সেই "জাইট-গাইষ্ট", (Zeit-Geist) সেই কালপুরুষের অঙ্গুলি-

সম্বেতেই সে আপনাকে ভাঙ্গিয়া নিত্য নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিত।" বেশ, ভাল কথা।

কিন্তু আবার ১০০ পৃঃ নলিনী বাবু লিখিতেছেন,—"প্রথম বিদেশী ভাবপ্লাবনে বাঙ্গলা যদি অতখানি আপনাকে না ছাড়িয়া দিত, যদি জাতিনাশের ভয়ে পিছাইয়া থাকিত, তবে আজ জগতের সাহিত্যের মহাজীবনস্রোত হই তে সে বিচ্যুত হইয়াই পড়িত। আমরা পদাবলী সাহিত্যের চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতাম নিঃসন্দেহ।"
—এ আবার কি প্রকার কথা হইল ?

বাঙ্গলাদেশে ইংরেজ আসাতেই—বাঙ্গলা সাহিত্যের সহিত ইংরেজের, তৎসঙ্গে ইউরোপের সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। গত শত বৎসরের বাঙ্গলা সাহিত্যে ইংরেজ বা ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণে,—যদি অনুকরণ কথাটা আপত্তিজনক না হয়,—সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বর্ণসঙ্কর সাহিত্য সম্বন্ধে আধুনিক বঙ্গবাণীর সেবকগণ সকলে একমত হইয়া ইহার জয়ধ্বনি করিতে পারিতেছেন না। একদল বলিতেছেন, এই শত বৎসরের সাহিত্য বাঙ্গালীর গৌরব। অন্যদল বলিতেছেন,—ইহা বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতা ও কলঙ্ক।

যে দল বলেন যে, এই শত বৎসরের বর্ণসঙ্কর বঙ্গ-সাহিত্য বাঙ্গালীর গৌরব—সেই দলই স্বভাবতঃ বলিতে চাহিবেন যে ইংরেজ না আসিলে ইংরেজী বা ইউরোপীয় সাহিত্যও বাঙ্গলায় আসিত না। আর এই বিদেশীয় সাহিত্যের ভাবপ্লাবনে বাঙ্গলা যদি অত-খানি আপনাকে না ছাড়িয়া দিত, তবে—ইত্যাদি। কাজেই, আমরা কেবল পদাবলী সাহিত্যের চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতাম,—নিঃসন্দেহ।

কিন্তু পক্ষান্তরে যে দল বলেন যে, এই শত বৎসরের অনুকরণ বা মিশ্রণ বা বর্ণসঙ্কর সাহিত্য বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতা ও কলঙ্ক, সেই দলই নিশ্চিত বলিতে চাহিবেন,—যে, ইংরেজ না আসিলেও,—ইংরেজী বা ইউরোপীয় সাহিত্য যে ভাবে আসিয়াছে, সে ভাবে না আসিলেও,—আমরা সমস্ত জগতে যে হাওয়া বহিতেছে, সেই জাইট-গাইষ্টের, সেই কালপুরুষের অঙ্গুলিসঙ্কেতে, আমাদের এ যুগের সাহিত্যকে ভাঙ্গিয়া নিত্য নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিতাম। কেবল আজ বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস অনুকরণে পদাবলী সাহিত্যেরই চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতাম না; এবং বলা বাহুল্য, তাঁহারাও নিঃসন্দেহ।

যাহা হউক, এই পরস্পর-বিরোধী দুইটি মত বা সিদ্ধান্তের কোনরূপ সমালোচনা না করিয়াও—আমরা নলিনী বাবুর প্রবন্ধ-সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, সাহিত্যে দুই দল থাকিতে পারে,—সাহিত্যিক মত ও সিদ্ধান্তে দুই বিরুদ্ধ দলও থাকিতে পারে,—কিন্তু এক প্রবন্ধে, এক পৃষ্ঠার ব্যবধানে, এক মতের আবরণে এরূপ পরস্পর-বিরোধী দুই মত বা সিদ্ধান্তের কি করিয়া একত্রে সংকুলান হয়, তাহা এই সাহিত্যিক দলাদলির দিনেও আমরা বুঝিতে একটু কষ্ট পাইতেছি।

চিন্তা যেখানে স্বাধীন, সেখানে দুই কিংবা ততোধিক মত বা দলের সৃষ্টি বিশেষ আশ্চর্য্যের নয়, বরং স্বাভাবিক। চিন্তা যেখানে স্বাধীনতার নামে পরমুখাপেক্ষী ও পরভাবানুগামী,—সেই ভাব-দাসত্ব-প্রসূত দাস-জাতির সাহিত্যিক চিন্তারই অনেক আপদ। কেন না, সে জানে না নিজের স্বাধীনতাকে, সে জানে না নিজের

স্বাতন্ত্র্যকে, সে জানে না নিজের অন্তরাত্মাকে। সে প্রতি মুহূর্ত্তেই ভাব-দাসত্বে স্বীয় মনন-শক্তিকে বিক্রয় করিতেছে, সে প্রতি মুহূর্ত্তেই আপনাকে হারাইতেছে। সকলের বিরুদ্ধেও যে তাহার একটা স্বতন্ত্র মত থাকিতে পারে,—ব্যক্তিত্বের, বৈশিষ্ট্যের, স্বাধীনতার ও মনুষ্যত্বের এত বড় আদর্শ,—সে আজ কল্পনাই করিতে পারে না। নিজের মত সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা ও প্রবল বিশ্বাস থাকিতে হইলে যে স্বাধীনতা, সাধনা ও সংযম আবশ্যক, তাহার তা নাই।

স্ববিরোধিতা সাহিত্যিক চিন্তায় কেন আসে, তাহারও কারণ আছে।

বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে দলাদলি

নলিনীবাবু "বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে একটা দলাদলি" দেখিতেছেন। এবং দেখিয়া তিনি এই দলাদলিকে দুইটি বিশিষ্ট দলে বিভক্ত করিতেছেন,—"একদল সাহিত্যিক বাঙ্গলার যে প্রাণের কথা, যে বিশিষ্টতা, তাহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সকল দেশভক্তকে আহ্বান করিতেছেন। * * * এই স্বদেশভক্তগণ বাঙ্গলার প্রাণের ধারার একটা সুর ধরিয়া দিতেছেন, বলিতেছেন,—"হে বাংলার কবি, এই সুরকে ভুলিও না, এইখানে তোমার অন্তরাত্মা, বিদেশীয় সাহিত্যের সুরে এই দেশী সুরটি মিশাইয়া হারাইয়া ফেলিও না। বাংলার প্রাণ হইতেছে বৈষ্ণবের প্রাণ, তাহার সাহিত্যের মৌলিক সুর—পদাবলীর সুর।"

অন্য বিরোধী দল বলিতেছেন,—"বিদেশীয় সাহিত্যের সহিত

জাতীয় সাহিত্যের অবাধ মিশ্রণেই সব সজীব সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। * * * সাহিত্য বা শিল্পের জগতে জাতি অপেক্ষা বড় কথা হইতেছে—বিশ্ব। জাতীয়ত্বের সংকীর্ণতা লইয়া তুমি কবি—যিনি বিশ্বস্রষ্টা—হইতে পার না। * * * আর দেশী সাহিত্যের প্রাণ বলিয়া যে জিনিষ, তাহা অতি সূক্ষ্ম—ছায়াময় পদার্থ।"

নলিনী বাবু বর্ত্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে শুধু দলাদলি দেখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি আলোচ্য প্রবন্ধে নিজেকে এক দলভুক্ত করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন ও আত্মমত প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন। 'প্রবাসী'র লেখক নলিনী বাবু এ প্রবন্ধে বাঙ্গলা সাহিত্যের দলাদলিতে বিশ্বের (?) দলে। 'বিশ্বের' দলভুক্ত হইয়া নলিনী বাবু তাঁহার কল্পিত বিরুদ্ধ দলকে,—যে সমস্ত হিতবাক্য বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। নলিনী বাবুর বিরুদ্ধ দলকে 'বাঙ্গলার দল' এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সাহিত্যক্ষেত্রে যুধ্যমান তুইদল এখন হইতেছে—বাঙ্গলা ভার্স'াস্ বিশ্ব।

বাঙ্গলার দলের সকলেই সমস্ত বিষয়ে একমত নহেন। বিশ্বের দলেরও তাই। তথাপি এই উভয় দলের মূল মতের সহিত সহানুভূতি দ্বারাই কে কোন্ দলভুক্ত, বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে।

নলিনী বাবু বিশ্বের দলের। অথচ বাঙ্গালী জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাসের অন্ত নাই। বিশ্ব নিরপেক্ষ হইয়াও বাঙ্গালী জাতি এ যুগে সাহিত্যক্ষেত্রে আপনাকে ভাঙ্গিয়া নিত্য নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিত। "ইংরেজ যদি না আসিত, কোন বিদেশীর ছায়াই যদি বাঙ্গলার প্রাণকে না ঢাকিয়া ফেলিত,

তবুও"—নাকি বাঙ্গালী তাহা পারিত। নলিনী বাবুর এই প্রকার বিশ্বাস।

কিন্তু ইহা কি বিশ্বের দলের কথা? ইহার মধ্যে যে স্পষ্ট বাঙ্গলার দলের গলার আওয়াজ পাওয়া যায়।

নলিনী বাবু পূর্ব্বোক্ত মতটি বিশ্বের দলে ভুক্ত হইয়াও বাঙ্গলার দলের অনুকরণ করিয়া কহিয়াছেন। আবার কেঁচে গণ্ডুষ করিয়া এক পৃষ্ঠা পরেই বলিতেছেন,—বিদেশী ভাব-প্লাবনে বাঙ্গালী যদি কায়মনবাক্যে না ভাসিত—তবে কি হইত,—কিছুই হইত না। বিদেশি-ভাবনিরপেক্ষ বাঙ্গালী জাতির দ্বারা কোনই আশা ছিল না। ইংরেজ না আসিলে—সে নিঃসন্দেহে আজ কেবল পদাবলী সাহিত্যের চর্ব্বিত চর্ব্বণই করিত।

ইহা খাঁটি বিশ্বের দলের কথা। বাঙ্গলার দলের কথাও বুঝি। কিন্তু বুঝি না নলিনী বাবুর একসঙ্গে পরস্পর বিরোধী দুই দলের কথা। বস্তুতঃ নলিনী বাবুর মত কি দুই দলের মধ্যে দোলায়মান? সম্ভবতঃ তাঁহার মত পূরাপূরী কোন দলভুক্ত এখনও হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁহার উপর দুই দলেরই আশা ও আশঙ্কা এখন পর্য্যন্ত সমান।

বঙ্গদেশ ও আয়র্লণ্ড

বাঙ্গলা সাহিত্যের দুই দলের মধ্যে, 'বাঙ্গলার দলকে' আয়র্লণ্ডের কেল্‌টিক জাগরণের Celtic Revival দলের সহিত নলিনী বাবু তুলনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই দুই দলই তাঁহাদের জাতীয় সাহিত্যকে সাধারণভাবে বিদেশীয় সাহিত্য আর

বিশেষভাবে ইংলণ্ডীয় সাহিত্যের প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। বঙ্গদেশ ও আয়র্লণ্ড সাহিত্য ছাড়িয়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও ইংলণ্ডের প্রভাব এত অধিক অনুভব করিতেছে যে, বঙ্গসাহিত্য, 'বাঙ্গলার দল' ও কেলটিক জাগরণের দলের মধ্যে একটা ভাবগত সাদৃশ্য থাকারই সম্ভব। তথাপি বাঙ্গলার দলের বা কেলটিক জাগরণের একমাত্র উদ্দেশ্য ইংলণ্ডের প্রভাব হইতে সাহিত্যিক মুক্তি নহে। প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতিই যখন নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়, তখন সে নিজের ভাবকেই প্রকাশ করিতে চায়, অনুকরণ মোহ ত্যাগ করে। বাঙ্গলার দলের বা কেলটিক জাগরণের ইহাই গোড়াকার কথা। নলিনী বাবু এই কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিতে দ্বিধা করিয়াছেন। তথাপি আশা করি—তিনি এ বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী হইবেন না।

এই প্রসঙ্গে নলিনী বাবু আর একটি কথা বলিয়াছেন—যে, "কেলটিক জাগরণ রক্ষা পাইবে"—কেন না—তাহার মধ্যে "নিগূঢ় আধ্যাত্মিক স্পৃহা" এবং "সমুদ্রের রহস্যের প্রতি টান" রহিয়াছে। পরন্তু "বাংলার পদাবলী সাহিত্যের পুনঃস্থাপন-চেষ্টার মধ্যে এইরূপ বিশ্বতোমুখভাব কিছু—"দেখা না যাওয়াতে, নলিনী বাবু "নিঃসন্দেহে ভবিষ্যদ্বাণী" করিয়াছেন যে, "এ প্রয়াস টিকিবে না।" কারণ ?—"এই বৈষ্ণব আদর্শ একদিকে যেমন বিশ্ব-আদর্শ নয়, অন্য দিকে তাহা বাঙ্গলার প্রাণের সব কথা নয়।"

কেলটিক জাগরণের যে দুইটি বিশেষ লক্ষণ শ্রুত হওয়া গেল, (১) "নিগূঢ় আধ্যাত্মিক স্পৃহা", (২) আর "সমুদ্রের রহস্যের প্রতি টান"—সে দুইটি কি বস্তু, তাহা যদি নলিনী বাবু একটু পরিষ্কার

করিয়া বুঝাইয়া দিতেন, তবে ভাবিয়া দেখিতাম, অবস্থাভেদ সত্ত্বেও হতভাগ্য বৈষ্ণব আদর্শ ও সাহিত্যের পুনঃস্থাপন চেষ্টায়, সেরূপ লক্ষণাক্রান্ত কোন বস্তু আছে কি না। কেন না, নলিনী বাবু শুনিয়া আশ্চর্য্য নাও হইতে পারেন, যে, বৈষ্ণব আদর্শ ও সাহিত্যের পুনঃস্থাপন-প্রয়াসীর দল কায়মনোবাক্যে ইচ্ছা করেন, যাহাতে তাঁহাদের চেষ্টা,—নানারূপ বিরুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও,—কিছু দিন টিকিয়া যায়—এবং কিছু স্থায়ী ফল প্রসব করে!

হায়, চণ্ডিদাসের কাব্য, মহাপ্রভুর ধর্ম্ম আর জীব বলদেবের দর্শন,—তোমাদের ধর্ম্ম ও সাহিত্যের আদর্শে কি,—ঐ কি বলে,— —"সমুদ্রের রহস্যের প্রতি টান" (?) আর "নিগূঢ় অধ্যাত্মস্পৃহার" এক কণিকাও ছিল না?—হায়,—যদি তোমরা এই কেল্‌টিক জাগরণের পরে জন্মিতে!

নলিনী বাবু বলেন যে, বৈষ্ণব আদর্শ একদিকে যেমন বিশ্ব-আদর্শ নয়, অন্যদিকে তাহা বাঙ্গলার প্রাণের সব কথা নয়। 'বিশ্ব-আদর্শ' কথাটি যদি নলিনী বাবু "ভাষায় আজ্ঞা করিতেন" তবে বুঝিতেও বা পারিতাম। দুঃখের বিষয়, ঐ কথাটীর তাৎপর্য্য আমরা এতাবৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে অপারগ হইলাম। কাজেই বৈষ্ণব আদর্শ 'বিশ্বআদর্শ' নয়, কি হয়, আমরা তাহা বলিতে পারিলাম না, এবং নলিনী বাবুর সিদ্ধান্তও স্বীকার করিতে বাধ্য থাকিলাম না। তবে "বৈষ্ণব আদর্শ বাঙ্গলার প্রাণের সব কথা নয়", নলিনী বাবুর এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য।

যে বাঙ্গলার সমস্ত গোটা প্রাণটা এক সঙ্গে দেখিয়াছে, সেই কেবল বলিতে পারে, যে, সেই সমগ্রের মধ্যে বৈষ্ণব অংশ

কতটুকু। এবং বৈষ্ণবের কথা বাঙ্গলার প্রাণের সব কথা নয় কি না।

নলিনী বাবু বলিয়াছেন, "প্রাণ বলিয়া যে জিনিষ, তাহা অতি সূক্ষ্ম-ছায়াময় পদার্থ—।" অথচ এই সূক্ষ্ম-ছায়াময় পদার্থের সমগ্র ও অংশের দর্শন শেষ করিয়া নলিনী বাবু সমগ্র বাঙ্গলার প্রাণের সহিত বৈষ্ণবের অংশের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।

সাহিত্যের প্রাণ বা জাতির প্রাণ-বস্তুর এইরূপ সমগ্র ও অংশের বিশ্লেষণ ও বিচার অতিশয় ভ্রমাত্মক। জড় বস্তুর যেরূপ সমগ্র আর অংশের বিশ্লেষণ হয়,—চিৎ বস্তু বা প্রাণের সেরূপ হয় না। ব্যক্তির সংবিৎ বা প্রাণের বিশ্লেষণ যেরূপে সম্ভব, জাতির প্রাণের বিশ্লেষণ তাহা অপেক্ষাও জটিল। ব্যক্তির প্রাণের গতির কেন্দ্র বহু হইলেও স্থিতির কেন্দ্র একটি। কিন্তু জাতির প্রাণের অসংখ্য স্থিতি-কেন্দ্র। এই অসংখ্য স্থিতিকেন্দ্র হইতে যুগপৎ বহুবিচিত্র ভাব ও আদর্শ নাম-রূপের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। আবার এই যুগের পর অন্য যুগে এই সমস্ত আদর্শ ও তদঙ্গীয় নাম-রূপ পরিবর্ত্তিত হয়।

এখন জাতির কোন একটি প্রাণ-কেন্দ্রকেও, কোন একটি ভাব ও আদর্শকেও বা তাহার আশ্রয়কারী কোন একটি নাম-রূপকেও, যেমন সমগ্র বলা যায় না, তেমনি অংশও বলা যায় না। আমি নলিনী বাবুকে ইহা বিশেষরূপে বুঝিয়া দেখিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। অংশের সমষ্টি যোগ দিয়া জড়-বস্তুর সমগ্র মিলে,—প্রাণ-বস্তুর অংশ ও সমগ্রের হিসাব এরূপ করিলে চলিবে না।

প্রাণ-বস্তুর কোন একটা বিশেষ ভাবের মধ্যে সমগ্র প্রাণ নাই,
ইহা বলা যায় না।

জাতির কোন একটা আদর্শে, যাহা কোন বিশেষ নাম-রূপের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে,—জাতির সমগ্র প্রাণের প্রেরণা নাই—ইহা বলা যায় না। এ যুগের যাহা আদর্শ, পরবর্ত্তী যুগে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে সত্য,—কিন্তু তাই বলিয়া এ যুগের আদর্শে ও তাহার প্রকাশে জাতির সমগ্র প্রাণ-শক্তি নিয়োজিত হইতেছে না,—এরূপ বলা চলে না। প্রাণ, বিশেষতঃ জাতির প্রাণ, অনন্তকালের অনন্ত বিকাশের সম্ভাবনাকে বীজরূপে আপনার মধ্যে লুকায়িত রাখিয়াছে। এই জাতির প্রাণ-শক্তির যেমন অনন্ত বিকাশের সম্ভাবনা সত্ত্বেও তাহা এক এবং অখণ্ড, তেমনি ইহার প্রত্যেক বিকাশই অংশ নয়,—অংশের বিকাশ নয়,—সমগ্রের বিকাশ। বৈষ্ণব আদর্শ বাঙ্গলার সমগ্র প্রাণের এক অখণ্ড প্রেরণা-প্রসূত। বাঙ্গলার প্রাণ দুই নয়,—এক। সেই এক অখণ্ড সমগ্র বাঙ্গলার প্রাণের বিকাশ এই বৈষ্ণবাদর্শ।

যেহেতু বিকাশ অনন্ত, সেই হেতু, বৈষ্ণব হইতেও বাঙ্গলার প্রাণ এক যুগে বা ভিন্ন যুগে বিভিন্ন আদর্শের সৃষ্টি করিবে। যাঁহারা এক যুগের বা ভিন্ন যুগের বিভিন্ন আদর্শগুলিকে, খণ্ড বা অংশ মনে করিয়া, তাহার যোগফল বা সমষ্টি দ্বারা বাঙ্গলার সমগ্র প্রাণের হিসাব করিবেন, তাঁহারা অঙ্কশাস্ত্রে সুনিপুণ হইতে পারেন, কিন্তু প্রাণ সম্বন্ধে তাঁহারা জড়বাদী। মনোবিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান এখনও তাঁহাদের যন্ত্রের সহিত আয়ত্ত করিবার বিষয়। হিন্দু-প্রতিভার, বাঙ্গালী-প্রতিভার বিশেষত্ব—যে অংশের মধ্যে

সমগ্রকে দেখা, তাহাও তাঁহাদের এখন পর্য্যন্ত জ্ঞানের ও বাঙ্গলার বহির্ভূত। সমগ্রের মধ্যে অংশকে মিলাইয়া দেখ,—গ্রীসের নিকট হইতে ইউরোপ যাহা পাইয়াছে, আর ইউরোপের নিকট তিন নকলে আসল খাস্তা করিয়া আমরা যাহা পাইয়াছি, সেই ধার করা জ্ঞানবিজ্ঞানই,—বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের বাঙ্গলার দল, বৈষ্ণব পক্ষপাতী দল পর্য্যাপ্ত মনে করিতে পারিতেছেন না বলিয়া যেন নলিনী বাবু ক্ষুব্ধ না হয়েন।

সমালোচনায় অনুকরণ

নলিনী বাবু বলেন, সাহিত্যের সৃষ্টিতে বৈদেশিক প্রভাব অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য। দৃষ্টান্ত—চসারের প্রেরণা আসিয়াছিল ফরাসী ও ইতালী হইতে, এলিজাবেথীয় যুগের প্রেরণা আসিয়াছিল ইতালী হইতে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রেরণা আসিয়াছিল, জার্ম্মেণী হইতে, রসেটি গিয়াছিলেন ইতালীয় ফরাসী কবিদের কাছে, সুইনবার্ণ গিয়াছেন সকল বিদেশীর কাছে—ইত্যাদি। ফরাসী সাহিত্যও যদি না ইতালী, স্পেন, জার্ম্মেণী ও ইংলণ্ডের প্রাণ আত্মসাৎ করিত, তবে ক্রভেয়্যার ও ক্রবাদুর সাহিত্যের যুগ সে অতিক্রমই করিতে পারিত না।

এই সকল দৃষ্টান্ত—ইউরোপীয় সাহিত্যের যে কোন ইতিহাস-পুস্তক হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে অক্লেশেই যে কোন ইংরেজী স্কুলের বালক দেখিয়া লইতে পারে। উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তগুলির মূলে যদি নলিনী বাবুর কোন স্বাধীন মত থাকিত, তবে তাহার আলোচনা করিয়া লাভ ছিল। বিস্তৃতভাবে ঐ সমস্ত দৃষ্টান্তের আলোচনা

করিলে ইউরোপীয় সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণকে আলোচনা করা হইবে,—নলিনী বাবুকে নহে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমার তাহা অভিপ্রেত নহে।

তথাপি নলিনী বাবুকে স্মরণ করাইয়া দিতে বাধ্য হইতেছি যে, ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মেণ প্রভৃতি ইউরোপের খৃষ্টান জাতি-সমূহের মধ্যে ভাষা ও ভাবপার্থক্য সত্ত্বেও, এক সাধারণ সভ্যতা ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান বিদ্যমান। রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাঁহারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ও স্বাধীন। তাঁহাদের মধ্যে সাহিত্যের আদান-প্রদান যেরূপে সম্পাদিত হইয়াছে ও হইতেছে,—বাঙ্গলা দেশের সহিত কি সেইরূপ সাহিত্যিক আদান-প্রদান গত শত বৎসরে সম্ভব হইয়াছে? ইংলণ্ডের সহিত আমাদের যে সম্পর্ক, তাহাতে কি ইংলণ্ড বা ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত আমাদের সাহিত্যের স্বাভাবিক আদান-প্রদান সাহায্য পাইয়াছে,—না বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে? আমরা যে ভাবে ইংলণ্ডের সহিত মিলিয়াছি, তাহাতে কি আমাদের সাহিত্যিক মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমরা স্বাভাবিক ভাবে আদান এবং প্রদান করিতে পারিয়াছি? বাঙ্গলা সাহিত্যের বাঙ্গলার পক্ষপাতী দল এই চিন্তা দায়স্বরূপ বঙ্গবাণীর সেবকদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছেন। বিরুদ্ধদলের মত মাত্রই বিরুদ্ধাচরণের যোগ্য নাও হইতে পারে।

ইউরোপের স্বাধীন জাতিরা পরস্পরের সহিত যেরূপ সম্বন্ধে সংবদ্ধ, আমরা বাঙ্গালীরা তাহা নহি। ইউরোপের উপর এক খৃষ্টান ধর্ম্ম ও সভ্যতা বিরাজমান, আমাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতা স্বতন্ত্র। আমরা ভুঁইফোড় একটা সে দিনের জাতি নই যে, চট্ করিয়া

রাতারাতি নিজের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া,—ইউরোপের এক নব সংস্করণ হইয়া উঠিব। সেরূপ চেষ্টা যে না হইয়াছে, তাহা নহে। কিন্তু তাহার পরিণামও আমাদের লক্ষ্য করিয়া দেখিবার বিষয়। গত শত বৎসরের ইউরোপ-অনুকারী বঙ্গ-সাহিত্য আর ইউরোপ-অনুকারী বাঙ্গালীর সমাজ ও ধর্ম্ম-সংস্কারের দল,—এ দুই-ই আমাদের আজ চিন্তার বিষয়। জাতীয় জীবনে ইহাদের স্থান কোথায়? এই চিন্তাকেই আমরা বাঙ্গালীর নিকট জাগ্রত করিতে চাই। সফলতা হউক আর নিষ্ফলতাই হউক, শত বৎসরের একটা জাতির উদ্যম উপেক্ষার বস্তু নহে। কাজেই ইউরোপীয় সাহিত্য—বিভিন্ন জাতির ভাবের আদান-প্রদান, ইউরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাস হইতে তুলিয়া দেখাইয়া বাঙ্গালীর সাহিত্যকে ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণে বা সম্যক্ চিন্তা না করিয়া ভাবমিশ্রণে গড়িয়া তুলিবার যে নজীর নলিনী বাবু দেখাইয়াছেন, তাহা যদি আয়র্লণ্ডের কেল্‌টিক জাগরণের দলই স্বীকার না করে, তবে বঙ্গ-সাহিত্যের—বাঙ্গলার পক্ষপাতী দল যে করিবেন, এরূপ আশঙ্কা আমি করি না।

নলিনী বাবু তাঁহার এই আলোচনামূলক প্রবন্ধে বঙ্গসাহিত্যের গত শত বৎসরের দুই তিনটি ধারাকে যে ভাবে আলোচনা করিয়াছেন,—তাহার মূলে রহিয়াছে ইউরোপের সাহিত্যের ইতিহাসের ধারা। ইউরোপের সাহিত্যকে অনুকরণ করিয়া যেমন গত শত বৎসরে বাঙ্গলার বর্ণসঙ্কর সাহিত্য জন্মিয়াছে, আবার আজ দেখিতেছি যে, সেই সাহিত্যের ধারার আলোচনা-প্রসঙ্গেও ইউরোপের সাহিত্যের ধারার মুখাপেক্ষিতা। ইহা অবশ্যম্ভাবী।

যে সাহিত্যের সৃষ্টিতে অনুকরণ, তাহার সমালোচনায় অন্যথা হইবে কেন? কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দুর্ভাগা বাঙ্গালী এই ভাব-দাসত্ব লুকাইতে চায় বাক্যের বিন্যাসে, বিশ্বের (?) দোহাই দিয়া।

আর সেই সঙ্গে 'বাঙ্গলার দলকে' বুঝিতে চায় কেল্‌টিক জাগরণের দলকে দিয়া——? নহিলে 'বাঙ্গলার দলের' অভ্যুদয়ের উদ্দেশ্য ও অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

রামমোহন,—মাইকেল,—রবীন্দ্রনাথ

নলিনী বাবু এই প্রসঙ্গে রামমোহন, মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন,—ইউরোপের সাহিত্যের ইতিহাসের ধারাকে সম্মুখে রাখিয়া। কেন না, বাঙ্গালী সমালোচকের সম্মুখে বাঙ্গলা সাহিত্যের ধারা আজ অস্পষ্ট, অন্ধ-তমসায় বিলুপ্ত, ইউরোপীয় সাহিত্যের ধারাই স্পষ্ট।

নলিনী বাবু কিছুকাল ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, বাঙ্গালীর সাহিত্যের ধারার দিক্ হইতেও রামমোহন মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা সম্ভব, এবং বঙ্গসাহিত্যে বাঙ্গলার দলের সে চেষ্টা সম্বন্ধে হঠাৎ যদি তিনি কোন ভবিষ্যদ্বাণী না করেন, তবে সেই চেষ্টা বা প্রয়াস কি পর্য্যন্ত টিকিবে, তাহা আমরা নহে,—ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা একদিন সম্ভবতঃ আলোচনা করিবার অবকাশ পাইবেন।

নলিনী বাবু রামমোহন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, রাজা যে "স্রোত বহাইয়া দিয়াছেন, তাহার উৎস পাইয়াছেন পাশ্চাত্ত্য হইতে, অথবা আরও ঠিক ঠিক বলিতে গেলে ইংলণ্ড হইতে।"

রামমোহন সম্বন্ধে আজিকার বঙ্গসাহিত্যে যিনি এতদূর "ঠিক ঠিক বলিতে" অগ্রসর,—তাঁহার কথা আমরা সবিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে উৎসুক।

রামমোহন সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে "অভিমানী ও তৎসংসর্গী গড্ডলিকা বলিকাবৎ গতানুগতিক অনেক" ব্যক্তির মতামতে বঙ্গ-সাহিত্যের এক অংশে বহু আবর্জ্জনা আসিয়া ক্রমে সঞ্চিত হইতেছে। দুঃখের বিষয়, নলিনী বাবুর রামমোহন সম্বন্ধে মতামত ও সেই আবর্জ্জনা-সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই করে নাই।

রামমোহন সাহিত্যিক ছিলেন,—তাহা মিথ্যা নয়। বাঙ্গলা সাহিত্যের গদ্য ও পদ্য এই উভয় দিকেই স্বীয় শক্তিকে সাধ্যমত নিয়োজিত তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে স্রোত বহাইয়া দিলেন—তাহার উৎস পাইলেন পাশ্চাত্য হইতে—অথবা আরও ঠিক ঠিক বলিতে গেলে ইংলণ্ড হইতে——এ কথার অর্থ কি, তাহাত বুঝিতেছি না।

নলিনী বাবু রাজা কর্ত্তৃক প্রবাহিত যে স্রোতের কথা বলিলেন, —সে কোন্ স্রোত? ব্যাপকভাবে রাজা কর্ত্তৃক প্রবাহিত যে সংস্কার-স্রোত—তাহাই, না সেই সংস্কার-স্রোতের যে অংশ সাহিত্যিক স্রোতোরূপে দেখা দিয়াছে, তাহাই——?

কেবল পাশ্চাত্য বা সঠিক ইংলণ্ড হইতে রাজার সংস্কার-স্রোত অথবা সাহিত্যিক স্রোত উৎসারিত হইয়াছে, এ কথা রাজার প্রবাহিত স্রোত সম্বন্ধে এবং রাজার সাহিত্য সম্বন্ধে যাহার কোনরূপ একটু পরিচয় আছে, তিনি যে বলিতে পারেন—আমার তা' বিশ্বাস নয়।

নলিনী বাবু ক্রোধ করিলে আমরা দুঃখিত হইব,—রামমোহন সম্বন্ধে স্ব-কল্পিত বা কানে-শোনা দায়িত্বহীন এরূপ উক্তি পাঠ করিয়া, আমরা মনে না করিয়া পারিতেছি না যে, নলিনী বাবু যাহা জানেন না, তাহাও লিখেন। রামমোহনের উৎস কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা জানিতে হইলে সমগ্র রামমোহন-সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে হয়, এবং অধ্যয়ন করিয়া তাহা আবার বুঝিতে হয়। বুঝিয়া তারপর দেখিতে হয়—উৎস আসিয়াছে কোথা হইতে? এইরূপ দেখার পরও যদি নলিনী বাবু বলেন যে, রামমোহন-স্রোতের উৎস আসিয়াছে—সঠিক ইংলণ্ড হইতে—তবে নিশ্চয়ই তাঁহার সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু এ যাত্রা নহে। কেন না, আমার বিশ্বাস, রামমোহন ধারার উৎস সম্বন্ধে নলিনী বাবুর কল্পনা রামমোহনের গ্রন্থাবলী পড়িবামাত্রই দূর হইবে। রাজা ইংলণ্ডের দু একটি দার্শনিকের চিন্তার সহিত পরিচিত ছিলেন,—তহ্ফাতুল মোহায়িদ্দীন গ্রন্থে এবং ঐ গ্রন্থে উল্লিখিত তাঁহার তৎপূর্ব্ব লিখিত—মানজারা গ্রন্থে—যাহা পরস্পর দুই তিন জন ব্যক্তির কথোপকথনের ছাঁচে রচিত হইয়াছিল,—হিউমের প্রভাব লক্ষিত হয়,—অথবা লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট রাজার স্মরণীয় চিঠিতে বেকন-দর্শনের প্রতি অনুরাগ দেখা যায় বলিয়াই,—কেহ এত তাড়াতাড়ি এবং এত ঠিক-ঠিক বলিতে পারেন না যে, রাজা তাঁহার স্রোতের উৎস পাইয়াছিলেন ইংলণ্ড হইতে।

"পাশ্চাত্য ভাব-সম্পৃক্ত রামমোহন' আমাদের—"জীবন-নদের মুখ খুলিয়া দিলেন"—ইহা অনেক বালকেও আজ বলিতে শিখিয়াছে। কিন্তু রামমোহনের মধ্যে পাশ্চাত্য, ইংলণ্ড বা অন্য

কোন ভাব কখন্ কিরূপ কার্য্য করিয়াছে,—ঐ ভাবের কিরূপ পরিবর্ত্তন—তাঁহার মানসিক বিকাশের পর পর স্তরে স্তরে দেখা দিয়াছে ; তিনি যে জীবন-নদের মুখ খুলিয়া দিলেন,—তাহা কোন্ দিক্ হইতে কেন বন্ধ হইয়াছিল—কোন্ দিক্ হইতেই বা খোলা পাইল,—নদের সেই খোলামুখ আজ আবার কোথায় আটকাইয়া গেল, এবং আটকাইয়া গিয়াছে কেন—রামমোহনের সমকালীন অন্যান্য উৎস যাহা রামমোহন হইতে পৃথক্ বা বিরোধী, তাহাই বা কোন্ ভাব-সম্পৃক্ত, এবং রামমোহনের ধারার সহিত সংঘর্ষণের কি ফল দেখা গিয়াছে ইত্যাদি বিষয়ের—ঠিক ঠিক আলোচনা ব্যতীত—রামমোহনের ধারার উৎস, প্রবাহ ও গতি সম্বন্ধে যথেচ্ছ দায়িত্বহীন আলোচনার মূল্য কি ?

নলিনী বাবু সম্ভবতঃ রামমোহনের সাহিত্যিক স্রোতের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। এবং রামমোহনের সাহিত্যের পূর্ব্বে বঙ্গ-সাহিত্যের "কত শত বৎসরের"—ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

——"চসারের পরে দেড় শত বৎসর ধরিয়া ইংরেজী সাহিত্যে যেমন একটা তামস যুগ আসিয়াছিল, চণ্ডিদাসের অথবা বৈষ্ণব কবিগণের পরেও তেমনি কত শত বৎসর ধরিয়া বঙ্গ-সাহিত্য তমোগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই যুগে কবি সম্প্রদায়ের যে একান্ত অভাব ছিল, তাহা নয়! তাঁহারা পদ্য যথেষ্ট লিখিয়াছেন, কিন্তু সে সকলের মধ্যে কাব্য খুব অল্পই মিলে।"

বিলাতী সাহিত্যকে অনুকরণ করিয়া বাঙ্গালী সাহিত্য সৃষ্টি করিতে গেলে যে বিপদ,—বিলাতী সাহিত্যের ধারাকে সম্মুখে

রাখিয়া বা অনুকরণ করিয়া বাঙলা সাহিত্যের ধারার ইতিহাস লিখিতে বসিলেও তাহা অপেক্ষা কম বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না। নলিনী বাবুর বিলাতী সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণমূলক, বাঙ্গালী সাহিত্যের ব্যর্থ সমালোচনাই তাহার দৃষ্টান্ত।

চসারের পর ইংরেজী সাহিত্যে তামস যুগ আসিয়াছিল,—সেই অনুকরণে ভাবিতে গিয়া চণ্ডীদাসের পর হইতে রামমোহনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্যেও এক তামস যুগ বিস্তৃত রহিয়াছে,—ভাবিলে বঙ্গ-সাহিত্যের ধারার উপর যেমন একদিকে সুবিচার করা হয় না, তেমনি আবার অন্যদিকে সাহিত্য-সমালোচকের অদ্ভুত অনুকরণ-স্পৃহা, এবং বিলাতী সমালোচনার অসার 'চর্ব্বিত-চর্ব্বণ' দেখিয়া বিরক্তির উদ্রেক না হইয়া যায় না।

যে যুগ সাহিত্য-সৃষ্টির ব্যাপারে আত্মনিষ্ঠ হইতে পারে না,—পরানুকরণ ভিন্ন যে যুগের সাহিত্য সৃষ্টি অসম্ভব,—সে যুগের অন্তে—সমালোচনা-সাহিত্যও যে ইংরেজী সমালোচনার প্রতিধ্বনি মাত্র করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

চণ্ডিদাসের পর হইতে রামমোহনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সত্যই যদি বঙ্গসাহিত্যে এক তামস যুগের ছায়া আসিয়া আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে,—তথাপি চসার ও তাঁহার পরবর্ত্তী যুগের চসমা ব্যতীত আমরা আমাদের নিজেদের দুর্গতির ছবিও দেখিতে পারিব না কেন? পাশ্চাত্য বা ইংলণ্ডের রঙীন চসমার সাহায্যে আমাদের জাতির বিলাতি ধারাকে আমরা গত একশত বৎসর ধরিয়া দেখিয়া আসিয়াছি—বিলাতী "বিশ্বের দল" আজ সেই চসমা দিয়াই দেখিতেছেন, নলিনী বাবুর চক্ষে যে চণ্ডিদাসের পর হইতেই এক

ভীষণ তামস যুগের ভয়াবহ শোচনীয় দৃশ্য আজ উদ্ঘাটিত হইতেছে —তাহাও সেই চসমার ভিতর দিয়াই। কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের 'বাঙ্গলার দল' সেই চসমা খুলিয়া ফেলিয়া আজ একবার সাদা চক্ষে তাঁহার দেশের রূপ, বাঙ্গলার রূপ, তাঁহার জাতির ইতিহাসের ধারা দেখিতে ইচ্ছা করেন, এবং সেজন্ত তাঁহারা এত কি মহাপাতকগ্রস্ত হইবেন, বুঝিতে পারি না।

নলিনী বাবু অনুকরণ-মোহে, তামস যুগের যেরূপ ঘোরালো ছবিই দেখুন না কেন,—আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, সেরূপ কিছু আমাদের দৃষ্টিকে পীড়া দিতেছে না।

চণ্ডিদাসের পর,—প্রায় শত বৎসর পর, মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অধিকাংশ পদকর্ত্তাগণ এবং মহাপ্রভুর জীবনচরিত-লেখকগণ—হয় তাঁহার সমসাময়িক, নয় তাঁহার কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী। বৈষ্ণব সাহিত্যের এই দুই ভাগ,—(১) পদাবলী ও (২) জীবনচরিত —তামস যুগের সাহিত্য বলিয়া নলিনী বাবু ধরিয়া লইলেও, আমরা তাহা অস্বীকার করিতে কোন সঙ্কোচ বোধ করিব না। গোবিন্দদাসে বিদ্যাপতির ছায়া থাকুক, জ্ঞানদাসে চণ্ডিদাসের ছায়া থাকুক, আর বলরামদাসে সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষভাবে কাহারো ছায়াই না থাকুক,—তথাপি এই সাহিত্য সৃষ্টি,—কেবল পূর্ব্ববর্ত্তীদের অনুকরণ নহে, ইহা সত্যই সৃষ্টি। ইহা তামস যুগের সাহিত্য নহে, —চণ্ডিদাসের গীত আর মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মকে যে সাহিত্য আচণ্ডালে বাঙ্গালী গৃহস্থের কুটীরে কুটীরে একদিন বিতরণ করিবার ভার লইয়াছিল, তাহাকে তামস যুগের সাহিত্য বলিয়া নিন্দা করার মত অজ্ঞতা ও মূঢ়তার পরিচয়, বিদেশী দিতে পারে,

বাঙ্গালী কি করিয়া পারে, বুঝি না। চণ্ডিদাসে যে কুঁড়ি দেখা দিয়াছিল—যে সুর ফুটিয়াছিল—সেই সুর যেদিন জীবনে ধরা দিল, —মহাপ্রভুর জীবনে যে দিন চণ্ডিদাসের কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হইল, সেই প্রস্ফুটিত পূর্ণবিকসিতের গন্ধ—যে সাহিত্য জাতির অলি-গলিঘুজির মধ্যে বহন করিয়া লইয়া গেল, চসার ও তাঁহার পরবর্ত্তীদের ধারার চসমা পরিয়া দেখিলে, তাহাকে ঠিক দেখা হইবে না।

পদাবলী-সাহিত্য ছাড়িয়া, জীবন-চরিত-সাহিত্যে লোচনদাস, বৃন্দাবনদাস, কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়,—তামস যুগের এক অতি নগণ্য জঘন্য সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন বলিলে—যে স্পর্দ্ধার প্রকাশ হয়, তাহা কেবল অজ্ঞতামূলক বলিয়াই উপেক্ষার বস্তু। এক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া, কয়চা ছাড়িয়া দিয়াও, যে তিনখানি জীবন চরিতের উল্লেখ করা গেল, তাহার যে কোন একখানের সহিত, রামমোহনের পর হইতে সাহিত্যিক স্রোতের মুখ খুলিয়া যাওয়ার পর, গত একশত বৎসরের কোন একখানি জীবনচরিত নলিনী বাবু যদি তুলনা করিবার চেষ্টা করেন, তবে নিশ্চিতই দেখিতে পাইবেন যে, জীবন হিসাবে ও সাহিত্য হিসাবে—তামস যুগ বাঙ্গলায় আছে বটে, কিন্তু তাহা রামমোহনের পরে না পূর্ব্বে, —তাহাই সমস্যা!

এই সমস্যাই আজকার সাহিত্যক্ষেত্রে 'বাঙ্গলার দল' বাঙ্গালার সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন। কেন না, এই সমস্যার মীমাংসা স্থির করিবে যে, বাঙ্গালী জাতির বিংশশতাব্দীর ধারা কোন্ পথে ধাবিত হইবে। রামমোহনের পর হইতে, রামমোহনী

ভাষায় বলিতে গেলে, অনেক ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিবিশেষেরা ও অনেক ধনী লোকেরা স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, তৎসংসর্গী গড্ডলিকা বলিকাবৎ গতানুগতিক যে সংস্কার ধারা,—সমাজ, ধর্ম্ম ও সাহিত্যে প্রবাহিত করিয়াছিলেন, বিংশশতাব্দীর বাঙ্গালীর সম্মুখে সেই বহুধাবিভক্ত "জীর্ণশীর্ণ মুমূর্ষু—" ধারা, যাহা মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া "বদ্ধ জলের মত"—"শত ময়লা আবর্জ্জনায়" দূষিত হইয়া উঠিয়াছে,—তাহাই পর্য্যাপ্ত,—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'। অথবা ইহা ছাড়াও বাঙ্গালীর নিজের আর কোন পথ আছে—?

বৈষ্ণব সাহিত্যের পদাবলী ও চরিতশাখা অতিক্রম করিয়া আমরা যদি কবিকঙ্কণ ও রায় গুণাকরে আসিয়া পড়ি, তবে সত্যই কি মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের কাব্য সৃষ্টি, তাহার দোষ সত্ত্বেও,—দোষ আছে জানি,—কেবল এক তামস যুগেরই পরিচয় দিবে? সৃষ্টির কোন বৈচিত্র্য, জাতীয় গৌরবের কোন চিহ্নই কি—ইঁহাদের কাব্য আমাদিগকে দেখাইতে পারিবে না? নানা-দিক হইতে ইহা এক অতি অবসাদের যুগ সন্দেহ নাই। তথাপি মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র রামমোহনের পরের বাঙ্গালীরও;—মাইকেল, রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গালীরও;—লজ্জা নহে, চাই কি তুলনায় একদিন তাঁহারা গৌরবের ভাগীও বা হইতে পারেন।

ইহার পর রামপ্রসাদ। রামমোহনের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বেই রামপ্রসাদ। সম্ভবতঃ রামপ্রসাদের মৃত্যুর বৎসরই রাজা রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন। বাঙ্গলার যে প্রাণ একদিন

চণ্ডীদাসে গাহিয়া উঠিয়াছিল,—বাঙ্গলার সেই প্রাণই আবার একদিন রামপ্রসাদে সুর পাইয়াছিল। "রসের শতধারা, আনন্দের সহস্ররেখা" যে একই বাঙ্গলার প্রাণ হইতে উৎসারিত হইয়াছে, সাহিত্যক্ষেত্রে 'বাঙ্গলার দল' তাহা জ্ঞাত নহেন, এমত ভাবিয়া নলিনী বাবু বৃথা কষ্ট পান কেন? সাহিত্যের কোন বিশেষ সুর, রূপ বা ধারা কালক্রমে নষ্ট হইলেই যে বাঙ্গলার প্রাণের অপমৃত্যু ঘটে, এ কথা ত বাঙ্গলার দল কখনো এতাবৎ বলেন নাই। বৃথা তাহা কল্পনা করিয়া, এবং বাঙ্গলার দলের স্কন্ধে সেই মিথ্যা অপবাদ চাপাইয়া দিয়া নলিনী বাবু বা তৎসংসর্গীরা যাহা বলেন বা করেন, তাহা ন্যায়মতে ও যুক্তিমতে 'সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য' হয়।

বাঙ্গলার প্রাণের অনেক সুর আছে। চণ্ডিদাস এক সুর—রামপ্রসাদ আর এক সুর। কিন্তু তাহারা বাঙ্গলার প্রাণের সুর। আর যাহা বাঙ্গলার প্রাণান্তকারী নিতান্ত বেসুর, তাহা রামমোহনের পরবর্ত্তী বাঙ্গালীর কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইলেই যে বাঙ্গলার প্রাণের সুর বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে—ইহার অর্থ কি, তাহা ত বুঝি না। এমন কি রামমোহন "পাশ্চাত্যভাব-সম্পৃক্ত" হইলেই যে তাঁহার কণ্ঠে বাঙ্গলার সুর নিশ্চিত ধ্বনিত হইবে, ইহা কোন্ সদ্‌বুক্তি হয়, আমরা ত বুঝি না।

রামমোহনের পূর্ব্বে যে সমস্ত বাঙ্গালী কবি—"পদ্য যথেষ্ট লিখিয়াছেন, কিন্তু সে সকলের মধ্যে কাব্য খুব অল্পই মিলে।" এই সিদ্ধান্তের অনুপাতে বৈষ্ণবপদাবলী ও চরিত-সাহিত্যে, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র-সাহিত্যে ত বটেই, রামপ্রসাদের গানেও

নলিনী বাবুর মতে "কাব্য খুব জমাই মিলে!"—এই শ্রেণীর সাহিত্যিক সমালোচনা এত অসার ও মিথ্যা যে, তাহা সাহিত্যিক বাদানুবাদের যোগ্য বলিয়া আমরা বিবেচনা করি না।

রামপ্রসাদ তামস যুগের নগণ্য জঘণ্য বিস্মৃত কবি। রামপ্রসাদের সময় বঙ্গসাহিত্য "তমোগ্রস্ত।" "কবিত্বের জলন্ত জীবনের পরিচয়" রামপ্রসাদে পাওয়া যায় না। রামপ্রসাদ-সাহিত্য "জীর্ণ শীর্ণ মুমূর্ষ—" "কোন প্রকারে দুই দণ্ড বাঁচিবার ক্ষীণ প্রয়াস মাত্র।" সাহিত্য-নদের মোহনা রামপ্রসাদের গানের সময় চরা বালুতে আটকাইয়া গিয়া বন্ধ ছিল। আর "সেই জীবন-নদের মুখ খুলিয়া দিলেন—পাশ্চাত্য ভাবসম্পৃক্ত রামমোহন।"

হায় রে চসার আর তার পরবর্ত্তী দেড়শত বৎসর!

নলিনী বাবু সম্ভবতঃ জ্ঞাত আছেন যে, রামমোহনও "পদ্য যথেষ্ট লিখিয়াছেন," তাঁহার তুলনায়। সেই সমস্ত পদ্যের সহিত রামপ্রসাদের পদ্য মিলাইয়া দেখিয়া, তাড়াতাড়ি না করিয়া চণ্ডিদাসের পর হইতে রামমোহনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সাহিত্যের সহিত—রামমোহনের পর হইতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য পর্য্যন্ত আর একবার অপক্ষপাত তুলনা করিয়া তিনি আমাদিগকে উপকৃত করেন। রামমোহনের পূর্ব্বের ও পরের বঙ্গসাহিত্য চসারী বিজৃম্ভণ পরিত্যাগ করিয়া, আর একবার তুলনা করিয়া দেখিবার জন্যই আমরা বিশেষ উৎসুক হইয়াছি। বৈষ্ণব পদাবলী ও চরিত-সাহিত্য, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্রের সাহিত্য, রামপ্রসাদের গীতি-সাহিত্য,—নলিনী বাবুর নিকট যেরূপ একটা ভীষণ—ঘোরালো রকমের তামস যুগের দৃশ্য প্রকট করিয়াছে ও তাহা

যেরূপ নগণ্য ও অখণ্ড বলিয়া নামোল্লেখের দাবী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া, উপেক্ষিত হইয়াছে, রামমোহনের সাহিত্য—বিশেষতঃ গদ্য-সাহিত্য আমাদের নিকট নিশ্চিতই সেরূপ উপেক্ষিত হইবে না।

রামমোহনের সাহিত্যের বা মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। পরে পরে হয় ত তাহাও আমাদিগকে করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য বা ইংলণ্ডের ভাব-সম্পৃক্ত গত শত বৎসরের সাহিত্যে বাঙ্গলার প্রাণের বিচিত্র সুরের কোন্ সুর—কি ভঙ্গিমায় ধ্বনিত হইয়াছে; এবং তাহা কতটুকু বাঙ্গলার প্রাণের সুর, এবং বাঙ্গলার প্রাণের সুর কি না, তাহা আমরা ক্রমে বঙ্গ-সাহিত্যসেবিগণকে আমাদের সাধ্যমত বলিতে চেষ্টা করিব। এ যাত্রা শুধু নলিনী বাবুর প্রবন্ধের মূল মত ও দু'একটি শাখা-মতের বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি জানাইয়াই ক্ষান্ত থাকিব।

নলিনী বাবু লিখিয়াছেন যে, রামমোহন সাহিত্য-নদের মোহানা খুলিয়া দিবার পর "মধুসূদন বজ্রতাড়নে দুই কূল ভাঙ্গিয়া তাহার জন্য বিস্তৃত উন্মুক্ত খাত কাটিয়া দিলেন।"

আমরা যেমন রামমোহনের অসাধারণ প্রতিভাকে স্বীকার করিয়াও তাঁহার মধ্যে বাঙ্গলার প্রাণের সুরের অল্পবিস্তর অভাব লক্ষ্য করি, তেমনি মাইকেলের অসাধারণ কবিত্বকেও স্বীকার করিয়া, তাঁহার কাব্যে বাঙ্গলার প্রাণের পরিচয় তেমন পাই না। মাইকেলের কাব্য তাঁহার সমকালীন বিচক্ষণ বিজ্ঞ সমালোচকেরা বিলক্ষণ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। মাইকেলের কাব্য-

সমালোচনায় বিজ্ঞেরাও সকলে সেকালে একমত হইতে পারেন নাই। নলিনী বাবুর মতের সহিত, আমাদের মত-পার্থক্য হইলেই যে আমরা উপেক্ষিত হইব, এরূপ আশঙ্কা আমাদের নাই। মাইকেল অসাধারণ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন অত্যন্ত দুঃসাহসী কবি। তাঁহার ১১ খানি বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ অসাধারণ কবিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু এত বড় কবিত্বশক্তিও, অনুকরণ-যুগের তাড়নায়—কি পরিমাণ ভ্রষ্ট, স্খলিত ও বিপথগামী হইয়া, জাতির সাহিত্যে অল্পাধিক নিস্ফল হইতে পারে, মাইকেলী সাহিত্যই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কেবল ক্ষমতা থাকিলেই হয় না, সেই ক্ষমতার অপপ্রয়োগে জাতীয় জীবন ও সাহিত্য কিরূপ বিপর্য্যস্ত হয়, মাইকেল আলোচনায়—আমরা বাঙ্গালীকে আজ তাহাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। কবিকঙ্কণের প্রতিভা হয় ত মাইকেলের প্রতিভার সমতুল্য নয়। তথাপি সেই তামস যুগের (?) কবিকঙ্কণে বাঙ্গালীর গৃহস্থালীর যে প্রাণের সুর ধ্বনিত হইয়াছে, সমগ্র মাইকেলী সাহিত্যে তাহা বিরল। মাইকেল যে কেবল পাশ্চাত্য-সাহিত্যেরি অনুকরণ করিতে গিয়াছেন, তাহা নয়, নাট্য-সাহিত্যে তিনি সংস্কৃতের অনুকরণ করিবার জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, অথচ তিনি অতি অল্পই সফলকাম হইতে পারিয়াছেন। দুই বিপরীত শক্তির টানে আবর্ত্তিত হইয়া মাইকেলী প্রতিভা, সাহিত্যের যে খেচরান্ন বাঙ্গালীকে একদিন স্পর্দ্ধার সহিত পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন,—তাহা আমাদের নিকট নিশ্চিতই গুরুপাক বলিয়া সসম্ভ্রমে উপেক্ষিত হইতেছে। জাতীয় খোলস তিনি তাঁহার কাব্যের উপাদানের জন্য গ্রহণ করেন নাই, এমন নহে।

কিন্তু জাতীয় খোলসের আবরণে যে বিজাতীয় ভাব ও আদর্শ তিনি আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন, তাহা অসামান্য প্রতিভার দান হইলেও আমরা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে অক্ষম. তিনি রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবতের চরিত্রগুলি গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কাব্যসৃষ্টিতে কবিত্বের পরিচয়ও দিয়াছেন যথেষ্ট, তথাপি তাঁহার কাব্যে বাঙলার প্রাণের সুরকে তিনি ফুটাইতে পারেন নাই বলিয়া আমাদের আক্ষেপ। অনুকরণ করিয়া, অসাধারণ বাঙালী যাহা ইচ্ছা আমাদিগকে দিয়া গেলেও, আমরা তাহাকেই বাঙলার বলিয়া—বাঙালীর বলিয়া, লইতে প্রস্তুত নহি। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বের কবিদের কাব্যে বাঙলার প্রাণের সুরের এমন মর্ম্মান্তিক অভাব, মাইকেল ভিন্ন আর কাহারও মধ্যে এত অধিক লক্ষিত হয় না। বাঙলার ভাব হইতে, প্রাণ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলেই, পদাবলীর কবিগণ অপেক্ষা কবিত্বশক্তিতে শ্রেষ্ঠ হইলেও 'ব্রজাঙ্গনাকাব্যে' তিনি সত্যই পদাবলী-সাহিত্যের যে নিষ্ফল "চর্ব্বিত-চর্ব্বণ" করিয়াছেন, তাহা আজিকার বহু নিন্দিত জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস হইতে বহু অংশে নিকৃষ্ট। রামমোহনের পূর্ব্বে পদাবলী-সাহিত্যের চর্ব্বিত-চর্ব্বণে যে একটা সার্থকতা দেখিতে পাই, রামমোহনের পরে মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথে, 'ব্রজাঙ্গনায়' ও 'ভানুসিংহের পদাবলীতে' সেই চর্ব্বিত-চর্ব্বণের পুনরাভিনয়ে একটা ব্যর্থতা ও নিষ্ফলতাই আমাদের চক্ষে পড়ে। মাইকেল বিদেশীর ভাষা কালে পরিত্যাগ করিয়া বাঙলা ভাষাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন সত্য ; কিন্তু তিনি কখনই জীবনে বাঙলার ভাবে ফিরিয়া আসিবার সময় পান নাই। সেই জন্যই বাঙলার ভাব ও প্রাণ, সুর ও রূপ

তাঁহার কাব্যে আমরা বিশেষরূপে পাই না। এই জন্ম তাঁহার এই যে আক্ষেপ—

> "হে বঙ্গ ? ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;
> তা সবে (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
> পর-ধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
> পরদেশে, ভিক্ষা-বৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"

ইহা শেষ পর্য্যন্ত একটা সরল প্রাণের অকপট আক্ষেপই রহিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গলার ভাষাকে মাইকেল ব্যবহার করিয়াছেন, বাঙ্গলার ভাবকে নহে।

বাঙ্গলার স্বভাবধর্ম্মে বৈচিত্র্য নাই—ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। বাঙ্গলার স্বাভাবিক বিকাশ, চণ্ডিদাস ও রামপ্রসাদ, এক নয়—দুই বিচিত্র। বাঙ্গালীর প্রাণে বীরভাব নাই, ইহা মিথ্যা। সাহিত্যে একদিন সেই বীরভাবের প্রকাশ হইতই এবং হইবেও। জীবনে প্রকাশ পাইলেই সাহিত্যেও প্রকাশ পাইবে। কেন না, সাহিত্য ও জীবন অঙ্গাঙ্গী। আর যদি কেহ মিথ্যা করিয়া বলেন যে, বাঙ্গলার প্রাণে বীরভাব কখনই নাই, এই বীরভাব "বিশ্ব" হইতে আনিয়া বাঙ্গলার প্রাণে ও বাঙ্গালীর সাহিত্যে জুড়িয়া দিতে হইবে, তবে আমরা বলি কি যে, স্বভাবধর্ম্মে যদি না থাকে, তবে কাজ নাই অমন মিল্‌টন বিশ্বের (?) ধার করা বীরভাবে—বীর-সাহিত্যে। কেন না, কাপুরুষতার এমন অকাট্য প্রমাণ আর কিছুতেই যে প্রকাশ হয় না। এই জন্যই মাইকেল অসাধারণ কবিত্বশক্তি লইয়া জন্মিয়াও, বাঙ্গালীর কবি হইতে পারেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের যুগ মাইকেল হইতে বহুপরিমাণে আত্মস্থ হইবার যুগ। মাইকেলের কবিপ্রতিভা যেরূপ যুগধর্ম্মে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভাও সেইরূপ তাঁহার যুগধর্ম্মকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। এক বিচিত্র পরিবর্ত্তনশীল যুগে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়। পরিবর্ত্তনের সমস্ত চিহ্নই রাবীন্দ্রিক সাহিত্যে দেদীপ্যমান। রবীন্দ্রনাথের গল্প-সাহিত্যে, এই চঞ্চল যুগের কত পরস্পরবিরোধী আকাঙ্ক্ষাগুলিও একত্রে—একসঙ্গে রেখাপাত করিয়া গিয়াছে। কিন্তু গল্প-সাহিত্য ছাড়িয়া দিয়া, পদ্যে, গানে ও নাট্যে যে রাবীন্দ্রিক প্রতিভা আমাদের সম্মুখে আসিয়া দেখা দেয়—তাহাও অনন্যসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচায়ক। রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই নাট্য ও গীতি-কাব্যের শাখায় আমরা যে বিচিত্র ছন্দের ঝঙ্কার শুনিতে পাই, তাহা ভারতচন্দ্রের বাঙ্গলাতেও উপেক্ষার বস্তু নয়। কাব্যের এই শাখায় রবীন্দ্রনাথের নিজের একটি স্বতন্ত্র ভাব আছে বলিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন। আমরা তাহার বিশদ আলোচনা হয় ত একদিন করিতে পারিব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিচিত্র ছন্দ ও ভাবের জন্য ইউরোপের কোন্ কোন্ কবির নিকট কতটা ঋণী, তাঁহার কোন্ কবিতা বা নাটক—ইউরোপের কোন্ কবির নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়াছে, তাহা অযথা লুক্কায়িত রাখিবার প্রয়াস না করিয়া, যদি আমরা তৎসম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তবেই একদিন রবীন্দ্রসাহিত্যকে আমাদের বাঙ্গলার চিরন্তন যে স্বাভাবিক সাহিত্য—তাহার বিকাশের সহিত মিলাইয়া দেখিতে পারিব এবং এইরূপ মিলাইবার পরে আমরা সম্ভবতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে একটা সঙ্গত ধারণায় গিয়া উপনীত হইব। তাঁহার সৃষ্ট

বহু বিচিত্র রসধারা,—তাঁহার রচিত বহু ভঙ্গিমচ্ছন্দ, তাঁহার কাব্যের বহুবিধ স্তর, উৎস হইতে উচ্ছ্বাস পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া ইহা নিশ্চিতরূপে বুঝা যাইবে যে, পাশ্চাত্যের কোন একজন কবিকে তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত আদর্শরূপে গ্রহণ করেন নাই এবং পাশ্চাত্যের বিখ্যাত এমন কবি অতি অল্পই আছেন, যাঁহার নিকট তিনি জ্ঞাতসারে ঋণী নহেন।

নলিনী বাবু বলিয়াছেন যে, সুইনবার্ণ নাকি গিয়াছেন, "এক-রকম সকল বিদেশীর কাছেই।" রবীন্দ্রনাথের পদ্য-সাহিত্য আলোচনায় আমাদেরও সেইরূপ ধারণা। ইউরোপের খ্যাতনামা এমন কবিই প্রায় নাই, যাঁহার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্যে ধরা যায় না। প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় কবিদের ভাবানুকরণে যে বিচিত্র ছন্দ ও রসের কাব্য রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে আমরা পাইতেছি—আমাদের জাতীয় সাহিত্যে—নলিনী বাবুর কথায়—এই "উচ্ছ্বসিত, তরঙ্গায়িত, বহুভঙ্গিমরুচির এক মহাপ্লাবন" কোন্ স্থান অধিকার করিয়া কতদিন টিকিবে, তাহা নলিনী বাবুর মত ভবিষ্যদ্বাণী করিতে অক্ষম বলিয়া, 'ঠিক ঠিক' বলিতে পারিলাম না! কাল একদিন ইহার অবশ্য বিচার করিবে।

আষাঢ়, ১৩২৫ সাল।

পুরাতন বনাম নূতন বাঙ্গলা সাহিত্য

(১)

বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা বড় অংশ যথেচ্ছ আচরণে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ স্ফীত হইতেছে। যাহা আবর্জ্জনা, তাহা আয়তনে যতই বৃহৎ হউক, সাহিত্যের গৌরব নহে,—কলঙ্ক।

প্রতিভার প্রধান কার্য্য মৌলিক কিছু সৃষ্টি করা। প্রতিভা আছে, অথচ তাহার সম্মুখে কোন সৃষ্টি নাই, কিংবা সৃষ্টি আছে অথচ তাহার পশ্চাতে কোন প্রতিভা নাই, ইহা একরূপ অসম্ভব। আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে এই প্রতিভা ও এইরূপ সৃষ্টি, বিস্তর অনুসন্ধান করিলেও, অতি অল্প পরিমাণেই পাওয়া যাইতে পারে। আর বিশেষ ভাগ্যবান্ ব্যতীত সাধারণের তাহা অপ্রাপ্য। কিন্তু পরাণুকরণরত পরমুখাপেক্ষী ভিন্ন এ কালে কি সাহিত্যে, কি সমাজে, বিশেষ ভাগ্যবানই বা কে? পক্ষান্তরে, কেবল দোষদর্শী নিছক নিন্দুককেও ত এই উগ্র ও প্রচণ্ড তাণ্ডবের দিনে ন্যায়নিষ্ঠ সাহিত্যিক বলা যাইতে পারে না। নিন্দুকের অদৃষ্ট বড় মন্দ। সে বিশেষ রূপেই ভাগ্যহীন।

স্তাবক ও নিন্দুকে মিলিয়া সম্প্রতি কিছুদিন হইতে সাহিত্যে, বিশেষভাবে সমালোচনা-বিভাগে যাহা সৃষ্টি করিতেছে, আবর্জ্জনা হিসাবে তাহা যতই বৃহৎ হউক, সাহিত্য হিসাবে তাহার মূল্য অতি অল্প। যদি বলা যায় আবর্জ্জনায়, কি 'সার' নাই? উত্তরে বলিব, অবশ্যই আছে, কিন্তু তাহা বৃক্ষাদির উপভোগ্য, মনুষ্যের নহে।

এই শ্রেণীর স্তাবক ও নিন্দুক আপাত-দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী ও যুধ্যমান। কিন্তু ইহার একে অন্যকে সম্ভব করিয়াছে। অযথা স্তুতি চলিলে তাহার অযথা নিন্দাও চলিবে। ইহা স্বাভাবিক। কাজেই মূলতঃ ইহারা উভয়ে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত। এমন অনেক দেখা গিয়াছে, যাঁহারা স্তাবকের পক্ষ লইয়া নিন্দুকের গালি দেন, আবার অনেকে আছেন—যাঁহারা নিন্দুকের পক্ষ হইয়া স্তাবকের উপর খড়্গ-হস্ত হয়েন। এমন ব্যক্তিদের পণ্ডিত বলিতে পারি না। যেহেতু, তাঁহারা নিন্দুক ও স্তাবকের অঙ্গাঙ্গী যোগ দেখিতে পান না।

সত্য বটে সমস্ত গরুর রং কিছু এক হইতে পারে না। সাদাও আছে, কালাও আছে। কিন্তু সমস্ত গরুর দুধের রং নিশ্চিতই সাদা। তেমনি সমস্ত সমালোচকই কিছু এক রংএর বা এক শ্রেণীর হইতে পারে না। কিন্তু সমস্ত সমালোচকের বক্তব্যই অন্ততঃ সমালোচনা হওয়া আবশ্যক। নিছক নিন্দা বা নিছক চাটুবাদে যে সমালোচনা নাই, তাহা নহে, তবে তাহা সমালোচনা অপেক্ষা নিন্দা ও চাটুবাদই বেশী। আমাদের অভিপ্রায়, এই নিন্দা ও চাটুবাদ কমিয়া যাহাতে সমালোচনার অংশ ক্রমে বৃদ্ধি পায়। কেননা, নিন্দা ও চাটুবাদ সাহিত্য নহে, সমালোচনাই সাহিত্য।

"পুরাতন ও নূতন বাঙ্গলা সাহিত্য" লইয়া সম্প্রতি একটা সমালোচনার তরঙ্গ উঠিয়াছে। বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকাগুলি খুলিলেই, প্রতিমাসে আমরা এই বিষয়ের দুই চারিটি সমালোচনার হস্ত হইতে কোন ক্রমেই অব্যাহতি পাইনা। ভারতবর্ষ,— বৈশাখ, ১৩২৬ সংখ্যায়, অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়

আবার আমাদিগকে এই শ্রেণীর এক সমালোচনা দ্বারা কথঞ্চিৎ বিব্রত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

ইতিহাসে যে সমস্ত জাতি প্রাচীনত্বের দাবী করেন, সভ্যতার উৎকর্ষ ও বিশেষত্ব হিসাবে এবং এমন কি, বয়স হিসাবেও বাঙ্গালী জাতি তাঁহাদের মধ্য হইতে ত ফেলিয়া দিবার নহে। বাঙ্গলার রাজ্যসীমা একদিন কপিলবস্তু পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল কি না, আর যুবরাজ সিদ্ধার্থ বিদ্যার্থী হইয়া কপিলবস্তুর রাজপ্রাসাদের কোন এক নিভৃত কক্ষে বসিয়া তৎকালীন (?) 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' ইতিহাস আলোচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহা কুশাগ্র-ধী প্রত্ন-তত্ত্ববিদের বিস্তর গবেষণার বিষয় হউক, তথাপি দুঃসাহসিক না হইয়াও এ কথা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, 'প্রাক্ ব্রিটিশ যুগের অতীতেও' বাঙ্গালীর ইতিহাস আছে, সাহিত্য আছে। বৌদ্ধযুগ কতদিন হইতে কতদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় স্থায়ী হইয়াছিল, এখনও তাহা অবিসংবাদিতরূপে কোন ইতিহাসে এম, এ, স্থির করেন নাই। গৌড়, একটা জাতির অতীত ইতিহাস বক্ষে লুকাইয়া ঘুমাইয়া আছে। গৌড় ত শুধু মুসলমানের ধ্বংসাবশেষ নয়। বৌদ্ধের মঠ ও হিন্দুর মন্দিরের বিলুপ্ত কাহিনীর কথাও সে বলে। তবে পাঠান ও মোগল যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যই একমাত্র 'পুরাতন বাঙ্গলা সাহিত্য হইবে কেন? পরে পরে বৌদ্ধ ও হিন্দুযুগের বাঙ্গলা সাহিত্য কোথায়? বৌদ্ধ ও হিন্দুযুগেত বাঙ্গালী বর্ব্বর ছিল না। বৌদ্ধ ও হিন্দুযুগের বাঙ্গালী যে সাহিত্য রচনা করিয়াছিল, এ কথাও বাঙ্গলা দেশে আজ প্রমান প্রয়োগ করিয়া বুঝাইতে হইবে।

এত বড় একটা প্রাচীন জাতির কতক আবিষ্কৃত, ও কতক অনাবিষ্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস লইয়া যাঁহারা "হেলায় লঙ্কা করেন জয়"—ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পুরাতন ও নূতন বঙ্গসাহিত্যের সমালোচক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদেরই একজন। বাঙ্গলা সাহিত্যের সমালোচনায়, তাহা পুরাতন হউক আর নূতনই হউক, আমরা কোনক্রমেই 'হেলায় লঙ্কা জয়ের' পক্ষপাতী নহি।

যিনি অধ্যাপক, তাঁহার নিকট আমরা শিক্ষণীয় নূতন কিছু আশা করি। আমাদের দুরদৃষ্ট, আমরা তাহা পাইলাম না। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক এ কালের বঙ্গ-সাহিত্যকে "চর্ব্বিত-চর্ব্বণের যুগ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনা পাঠ করিয়া আমাদেরও সেইরূপই মনে হইতেছে। কেন না, এমন কথাই তিনি বেশী বলিয়াছেন, বিশেষতঃ পুরাতন বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে,—যাহা তাঁহার পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে; এবং যে কথার অসারতা প্রতিপন্ন করিতে আমরা একাধিকবার প্রয়াস করিয়াছি। অধ্যাপক বলিতেছেন, পুরাতন বাঙ্গলা সাহিত্যের লক্ষণ,

—ক) "একটা প্রচলিত প্রথার (Convention) চারিদিকে কেন্দ্র করিয়া ঘোরা।" আর, তাহাতে—

—খ) "আধুনিক যুগের বিরাট্ প্রশ্ননিচয় ও তাহার সমাধান-চেষ্টা নাই।"

অনুকরণ-যুগের বাঙ্গালী, জীবনের বৈচিত্র্য বলিতে যে কি বুঝে, তাহা অন্ততঃ সমালোচনা-সাহিত্য এ পর্য্যন্ত বিশদ করিয়া বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। আর এই জীবনের বৈচিত্র্যই

নাকি এ যুগের সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে, এমনও কদাচিৎ শুনা যায়। আমরা ত এই বৈচিত্র্যের অর্থ বুঝি না। বাঙ্গালীর মনে অভূতপূর্ব্ব কোন্ বৈচিত্র্যের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে? আমরা ত দেখি,—'আছি কাঠের মুরাদ খাড়ামাত্র গণনাতে সবে।'

আর দ্বিতীয় অভিযোগ যে, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য 'আধুনিক যুগের বিরাট্ প্রশ্ননিচয় ও তাহার সমাধান-চেষ্টা করেন নাই।' আশ্চর্য্য! একজন অধ্যাপক, এরূপ 'সমাধান' (?) করিতে পারেন, ইহা আমরা ভাবিতে পারি নাই।

নূতন বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা এতদূর অসংবদ্ধ যে, কোন কোন স্থানে প্রলাপের মত শুনায়। প্রলাপ অনেক সময়ে পরস্পর-বিরোধী। নূতন বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে অধ্যাপক বলিতেছেন যে,—

—১) ইহা নিজের রূপ বজায় রাখিয়াও (মাইকেল) "ডিমক্রেটিক" (?) হইতে পারিয়াছে।

—২) আন্তর্জ্জাতিক ভাবের অবাধ আমদানী ইহাকে নমস্য ও বরেণ্য করিয়াছে।

—৩) কেবল ধর্ম্মমতের প্রকাশই আর সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য নহে।

—৪) সাহিত্যের "বস্তু" (?) আর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নাই।

—৫) সাহিত্য এখন বহুমুখী।

—৬) গত ৫০ বৎসরে সাহিত্য "সর্ব্ববিষয়ে সমৃদ্ধ, তরুণ ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।"

—৭) সাহিত্য এখন dynamic বা গতিশীল।

—৮) পুরাতন সাহিত্য অপেক্ষা নূতন সাহিত্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তি খুব বেশী হইয়াছে।

—৯) নূতন বঙ্গ-সাহিত্যে বাহির হইতে গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অধ্যাপক মহাশয় এই নূতন সাহিত্য সম্বন্ধেই আবার বলিতেছেন—

—১) নূতন সাহিত্যে একটা অবসাদের যুগ লক্ষ্য করা যায়।

—২) ইহা চর্ব্বিত-চর্ব্বণের যুগ।

—৩) নূতন সাহিত্যের একটা আদর্শ নাই, মান (standard) নাই।

—৪) নূতন সাহিত্যের যে কোন্ দেশীয় পরিচ্ছদ, তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

—৫) এই সাহিত্যে যে প্রভাব পরিস্ফুট, তাহা দেশী নহে,

—৬) আমাদের ভাষার ও জীবনের যথার্থ ইতিহাস নাই।

—৭) নূতন সাহিত্যে পুরাতনের উপর সে শ্রদ্ধা, সে অনুরাগ নাই।

—৮) এখন নাকি আবার পুরাতন আদর্শকেই বরণ করিয়া আনিতে হইবে।

—৯) সাহিত্যের নামে নাকি সব ব্যভিচার—ইত্যাদি মাসিক পত্রে (?)—দেখা দিয়াছে।

—১০) এ হেন যুগে সাহিত্যে সৃষ্টি-কৌশল অসম্ভব।

—১১) সুতরাং ইহা সমালোচনার যুগ, সৃষ্টির যুগ নহে।

অধ্যাপক মহাশয় নূতন বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাল ও মন্দের দিক্ দেখাইতে গিয়া তাহার মধ্যে কার্য্যকারণ-সম্পর্ক ও অঙ্গাঙ্গী যোগ দেখাইতে পারেন নাই, অথচ সাহিত্য একটা—"living organism", "dynamic" "progressive" এমন কি "amorphous growth", এই সমস্ত ইংরেজী শব্দ নির্বিচারে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমাদের দেশের আধুনিক অধ্যাপকেরা হয় ত বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না যে, না বুঝিলে বুঝান যায় না। পুরাতন ও নূতন বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে তিনি একটা সামঞ্জস্য-স্থাপনের জন্য ইঙ্গিত করিয়াছেন, কোন উপায় নির্দ্দেশ করেন নাই, করিতে পারেন নাই; অধ্যাপকের বক্তব্যের মধ্যে এইখানেই গুরুতর ত্রুটি আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

পুরাতন সাহিত্যের পক্ষপাতিগণ নূতন সাহিত্যের কঠোর সমলোচনা করিতেছেন। নূতন সাহিত্যের উকিলগণ পুরাতন সাহিত্যকে আমলই দিতেছেন না। এই দুই শ্রেণীর সমোলোচনাই একে অন্যকে জাগাইয়া তুলিতেছে এবং পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই শ্রেণীর সমালোচনায় বহু পরিমাণ একদেশদর্শিতা আছে। একদেশদর্শিতা সমালোচনার গুণ নহে, দোষ।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ সাল।

পুরাতন বনাম নূতন বাঙ্গলা সাহিত্য

(২)

'পুরাতন বনাম নূতন বাঙ্গলা সাহিত্য' নাম দিয়া মাঘের "প্রবাসী" শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় নামধেয় জনৈক লেখকের একটী প্রবন্ধ ছোট অক্ষরে ছাপিয়াছেন। এই শ্রেণীর প্রবন্ধ আগে আগে দেখিতাম—"প্রবাসী" বড় অক্ষরে প্রথম স্থান দিয়া ছাপিতেন।—

প্রবন্ধের নমুনা দিতেছি,—

—"সেকালের সমস্ত লেখাই যে আজ পর্য্যন্ত সমাদৃত হইতেছে—একথা বলা নিতান্তই ধৃষ্টতা!"

"সেকালে লেখার বিষয় ছিল কি?—সেই মামুলী কৃষ্ণ রাধার কুৎসা! অথবা কাল্পনিক একটা (অপ?) দেবতার কাল্পনিক লীলাকাহিনী! তান্ত্রিকযুগে রাধা-কৃষ্ণ গিয়া কালী-তারা আসিলেন, ইত্যাদি।"

—"সে সাহিত্যে 'ধর্ম্মের কথা' নাকি আছে। * * সবই ত অশ্লীল জঘন্য কুরুচিপূর্ণ কামকাহিনী।—রাধাকৃষ্ণের মারফতে অথবা বকলমে চলিয়া আসিতেছে।"

—"পূর্ব্ব-সাহিত্যে সমাজেরই বা এমন কি ইতিহাস আছে? যাহা আছে তাহাতে দেশবাসীর এমন যে কি নাড়ীর যোগ আছে, তাহাও ত আমার বোধশক্তির অগম্য—। * * * সমাজের প্রকৃত ছবি কোন্ গ্রন্থে আছে? * * * কোনও জীর্ণ পুঁথি-টুঁথি পাওয়া গিয়াছে নাকি?"

পুরাতন সাহিত্য সম্বন্ধে—প্রবন্ধের মত উদ্ধৃত করিলাম। এখন পুরাতন বাঙ্গালী সমাজ সম্বন্ধে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

—"সমাজ ছিল—চোখ-ঢাকা বলদের ঘানি। আশা ছিল কেবল বাঁচিবার, আর সাতবেটার বাপ অথবা মা হইবার। আর আকাঙ্ক্ষা ছিল—জাতিরক্ষা অর্থাৎ ছুৎমার্গ এবং আচার-পালন এবং 'অন্তে যেন ঐ চরণ পাই'।—ধারণা ছিল—সংসার মিথ্যা,—কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ। সংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ ॥* * * এই অন্ধ, পঙ্গু, মূক, বধির সমাজের মধ্যে কোনও বৈচিত্র্যই ছিল না।"

—"মানুষের মোক্ষ ছাড়া আরও অনেক উচ্চতর আশা ও আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত। সংসারে যখন সে আসিয়াছে—তখন তাহার মধুটুকু তাহাকে আহরণ করিতে হইবে—"। কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্—? অথবা সেই "ততঃ কিম্?"

নূতন সাহিত্য সম্বন্ধে?—উদ্ধৃত করিতেছি।

—"এ সাহিত্য সহস্রমুখ, বিচিত্র, অভিনব।"

—"এ সাহিত্য অজ্ঞ, অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত জনসংঘের এত শীঘ্র সম্যক্ বোধগম্য হইবে না।"

—"এই নব-সাহিত্যের সহিত বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতির ধাতুর যেরূপ যোগ আছে, সেকালে সেরূপ ছিল না।"

—"এ সাহিত্য সম্পূর্ণ জাতীয়, সত্য এবং যুগোপযোগী।"

বাঙ্গালীর পুরাতন ও নূতন সাহিত্য সম্বন্ধে এই প্রকার অভিমত বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ঘোষণা করা হইয়াছে। এবং "প্রবাসী" পত্রিকা ইহা ছাপাইয়াছেন!

এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা বহুবার বহুস্থানে

এবং বহু প্রকারে অতিশয় স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছি। সুতরাং বিস্তৃতভাবে এই প্রবন্ধের মতের পুনরায় আলোচনা না করিলেও চলিতে পারে। বিশেষতঃ এই প্রবন্ধের মত ও তাহার প্রকাশের ভঙ্গী এরূপ কদর্য্য যে, ইহা সমালোচনার যোগ্য নহে। তথাপি সংক্ষেপে আমরা এইমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইতেছি যে, প্রবন্ধ-লেখক,—

—বাঙ্গলার প্রাচীন ও নূতন সাহিত্য সম্বন্ধে সমান বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন।

—বাঙ্গলার প্রাচীন ও নূতন সমাজ, সাহিত্যে যেরূপ প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাও অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। আমাদের এইরূপ বিবেচনা হয় যে, বাঙ্গালীর প্রাচীন সাহিত্যে "বাঙ্গলার প্রাণ," অর্থাৎ বাঙ্গলার ধর্ম্ম, সমাজ, —কল্পকলার রূপান্তর প্রভৃতি বাঙ্গালী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও তাহার সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল। বাঙ্গলার প্রাণের ধারা তখন স্বাভাবিক ছিল। বাঙ্গালীর সাহিত্য ও জীবন তখন বাঙ্গলার প্রাণের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। মুসলমান যুগেও বাঙ্গলা আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইংরেজ-যুগে বাঙ্গলার সাহিত্য ও জীবন বাঙ্গলার প্রাণের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিপথগামী হইয়াছে। জীবনে কৃত্রিমতা আসিয়াছে, সাহিত্যে আবর্জ্জনা স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালীর সাহিত্য ও জীবন অস্বাভাবিক হইয়াছে। বাঙ্গালী ভয়াবহ পরধর্ম্মের ব্যর্থ অনুকরণে স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়াছে। ধর্ম্মভ্রষ্ট, পরানুকরণ-মোহে আচ্ছন্ন, বাঙ্গালী আজ আত্মরক্ষায় অসমর্থ। সমগ্র ভিক্টোরিয়া

(?)-যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যে বাঙ্গালী জাতির যে চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইয়াছে, সে চাঞ্চল্য কিসের এবং কাহাদের? তাঁহারা কয়জন? এবং এই বিশাল নিদ্রিত জনসংঘের সহিত তাঁহাদের কোন্ 'নাড়ীর' বা কোন্ 'ধাতুর' যোগকে দেখাইয়া দিবার স্পর্দ্ধা করেন?

আজ বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রহরে বাঙ্গালীর সাহিত্যের তপোবনে পেচক ডাকিয়া উঠিয়াছে। বলিতেছে—"মানুষের মোক্ষ ছাড়া আরও অনেক উচ্চতর আশা ও আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত। মোক্ষ ছাড়িয়া নাকি "সংসারের মধুটুকু আহরণ করিতেই হইবে।"

অধঃপতনের শেষ সোপানে দাঁড়াইয়া, শাক্ত ও বৈষ্ণবের দেশে জন্মিয়া, বাঙ্গালী আজ এ কি শুনিতেছে? অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘোর অমানিশার দুর্য্যোগে, সেই রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাতে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত, ততোধিক অভিশপ্ত বাঙ্গালীর মুখেও এমন প্রলাপ সে দিন কেহ শুনে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলা-সাহিত্যে যাঁহারা অশ্লীলতার বিভীষিকা দেখেন, তাঁহারাও সম্ভবতঃ এমন জঘন্য হুঙ্কারের নিদর্শন দেখাইতে পারেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলা সাহিত্য আহত, কিন্তু তথাপি তাহা আত্মস্থ। শতাব্দীর লোহিত শোণিত-সাগরে বাঙ্গালী সেদিন পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিয়া দেখিয়াছিল—তাহার শ্যামা মায়ের প্রলয়-নৃত্য। সেই ঘোর অন্ধকার নিশায়ও বাঙ্গালী জাগিয়াছিল।

—"ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।"

তারপর রাজা রামমোহন। "ব্রহ্ম-নিরূপণের কথা"য় বাঙ্গালী

সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীটাই ব্যয় করিল। কথায় কথা বাড়িয়া গেল, সাহিত্যে আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হইল। আজ সে শতাব্দীও চলিয়া গিয়াছে। আজ দেখিতেছি, শুধু "দৈত্যের হাসি।" আর শুনিতেছি, শুধু পেচকের ডাক, মোক্ষ ছাড়াও অনেক উচ্চতর যে সংসারের মধুটুকু, তাহা আহরণ করিতেই হইবে!

জগতের কোন সভ্য জাতির জাতীয় সাহিত্যের ও জাতীয় আদর্শের এতদূর অধঃপতন হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।

ফাল্গুন, ১৩২৫ সাল।

"ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ" ও বাঙ্গলা সাহিত্য

—মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গত হাওড়া সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির আসন হইতে যে অনন্যসাধারণ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহা একাধিক কারণে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গলা দেশে যাঁহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার স্পর্দ্ধা রাখেন, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প। এই অত্যল্প গুণিগণের মধ্যে স্যার আশুতোষ এমনি একজন মানুষ, যাঁহার স্পর্দ্ধার অনুরূপ যোগ্যতা আছে এবং যোগ্যতার অনুযায়ী স্পর্দ্ধা আছে।

৺বিহারীলালের—"মা বঙ্গ-ভারতী"র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ আলোচনা করিতে করিতে ৺হেমচন্দ্রের অতুলন দেশাত্ম-বোধের কল্পনায় পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। বৈদিক যুগের বিরাট সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া "এই বিংশ শতাব্দীতে জগতের গতি যে দিকে",—সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া, ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্য-গুলির ভবিষ্যৎ উন্নতি ও তাহার "প্রকৃত অভ্যুদয়" এবং "পূর্ণত্ব লাভের" পন্থা তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সমগ্র ইউরোপের বিভিন্ন সাহিত্যগুলির একসঙ্গে আলোচনা ও তাহাদের পরস্পর যোগাযোগ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, ঐ সমস্ত সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, বর্ত্তমান ইউরোপের

যে কোন সাহিত্যিকের পক্ষেই যে সহজ-সাধ্য নহে, তাহা আমরা জানি। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের মত একটি দ্বীপ নহে ;—আয়র্লণ্ডের মত একটি উপদ্বীপ ত নহেই। তা ভারতবর্ষ আর আয়র্লণ্ডের সাহিত্যিক উপদ্রবের মধ্যে,—কেল্টিক অভ্যুদয় আর "বাঙ্গলার প্রাণের" দলের অভ্যুদয়ের মধ্যে, যত কেন সাদৃশ্য কল্পিত হউক না। ভারতবর্ষ,—ইতিহাস ও ভূগোলের দিক্ দিয়া বিচার করিলে, ইউরোপের মতই একটি মহাদেশ। ইংরেজ, ফরাসী ও জার্ম্মাণ প্রভৃতি জাতিসকলের এক একটি বিশেষ সাহিত্য আছে। তাহা-দের বৈশিষ্ট্য যেমন আছে, তেমনি এক ইউরোপীয় সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়া তাহাদের মধ্যে একটা ঐক্যও আছে। স্যার আশুতোষ বলিতেছেন—"ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেরই এক একটি নিজস্ব ভাষা আছে, এবং তাহা অতি প্রাচীন।" 'ভাষা' অর্থে এখানে অবশ্য 'সাহিত্যও' বুঝিতে হইবে। আমরা বলি এই প্রাদেশিক সাহিত্যের মধ্যেই—সেই প্রাদেশিক সভ্যতার একটা বিশিষ্টরূপ,—যেমন বাঙ্গলা সাহিত্যে বাঙ্গলার রূপ,—ফুটিয়া উঠে। এখন ভারতের এই প্রাদেশিক প্রাচীন সাহিত্যগুলির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া, পরস্পরের মধ্যে একটা ভাবগত ঐক্য,—যাহা এক ভারতীয় সভ্যতার অন্তর্গত বলিয়া প্রাচীনকাল হইতেই বর্ত্তমান, তাহাকে এই বিংশ শতাব্দীর জাতীয়তার আদর্শে আরও বৃদ্ধি করিয়া, পরিপুষ্ট করিয়া, ভারতীয় সাহিত্যের উন্নতিবিধান করিতে হইবে। আলোচ্য অভিভাষণের ইহাই মূল ও সাধারণ বক্তব্য।

প্রাদেশিক সাহিত্যগুলিকে, সমগ্র ভারতে এক অখণ্ড জাতীয়-তার সৃষ্টি ও উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া যাঁহারা এতদিন মনে

করিয়াছেন, এবং এখনও সময় সময় করেন, এবং প্রাদেশিক সাহিত্যগুলিকে মুছিয়া দিয়া, অথবা বহু অংশে উপেক্ষা করিয়া, যাঁহারা হয় ইংরাজী কিংবা হিন্দি ভাষাকে সমগ্র ভারতের সার্ব্বজনীন জাতীয় ভাষা ও জাতীয় সাহিত্য করিয়া তুলিবার পক্ষপাতী, সেই উভয়দলের উক্তি ও যুক্তিকেই তিনি বিধিমত নিরসন করিবার জন্য প্রয়াস করিয়াছেন। স্যার আশুতোষ ভাষাগত ঐক্যের পরিবর্ত্তে ভাবগত ঐক্যের উপরেই সমধিক নির্ভর করিতে বলিয়াছেন। এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই ভাবগত ঐক্য বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত না হইলে,—এক জাতীয়ত্ব-বোধ সম্ভবপর হইবে না; এবং এক জাতীয়ত্ব-বোধ যেখানে সম্ভবপর নহে, সেখানে রাজ-নৈতিক আন্দোলন,—যাহা মূলে এক জাতীয়ত্ব-বোধের উপর নির্ভর করে, তাহা স্যার আশুতোষের ভাষায় বলিতে হইলে "আপাততঃ উত্তেজিকা-হইলেও পরিণতিতে চিত্তে অবসাদেরই সৃষ্টি করিয়া থাকে।"

প্রাদেশিক সাহিত্যগুলি কি করিয়া যে তাহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া, এক অখণ্ড ভারতের জাতীয়ত্ব-বোধের সহিত ঐক্য রাখিয়া, পরিপুষ্ট হইবে;—এক অখণ্ড ভারতের সভ্যতা ও সাধনা কি করিয়া যে প্রাদেশিক সাহিত্যের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্দ্ধিত হইবে, তাহার একটি কার্য্যকারী উপায় তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্যার আশুতোষ বলিতেছেন যে, সমগ্র ভারতে ৭।৮টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। প্রত্যেক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রাদেশিক ভাষায় এম, এ, পরীক্ষার সৃষ্টি হইবে। "যাঁহারা এই এম, এ, পরীক্ষায় উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ একটি মূল ভাষা ও তাহার সহিত অন্ততঃ একটি ভিন্ন

প্রদেশের ভাষায় পরীক্ষা
সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই দেশীয় ভাষায় এম
করা যায়, তবে প্রতিবর্ষে, আমরা এমন ২।৪ জন শিক্ষিত ব্যক্তি পাইব, যাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব মাতৃভাষা ছাড়া, ভারতের অপর ২।৪টি ভাষাতেও সুপণ্ডিত। * * ফলে দাঁড়াইবে এই,—ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে শিক্ষাদীক্ষা, মতি গতি, সমস্ত ক্রমে এক হইতে আরম্ভ করিবে। এক দেশের যে সাহিত্য উত্তম, এক দেশের যে কবিতা উত্তম, এক দেশের যে লেখায় দেশবাসী ধন্য, তাহা অন্য দেশের ভাষায় প্রবিষ্ট হইবে।"

প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করিয়া, পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান করিয়া, কিরূপে সমগ্র ভারতে একটা ভাবগত ঐক্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়,—সাহিত্যে "বাঙ্গলার দল" বলিয়া যাঁহারা উপহসিত, তাঁহাদেরও ইহাই চিন্তা। স্যার আশুতোষ বলিতেছেন, "বাঙ্গালী বাঙ্গালীই থাকিবে, পাঞ্জাবী পাঞ্জাবীই থাকিবে, অথচ তাহারা পরস্পরে পরস্পরের যাহা কিছু উত্তম, নিষ্পাপ, নির্ম্মল, মনোহর, তাহা নিজের নিজের ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়া, ক্রমে ধীরে ধীরে এক হইতে শিখিবে, ইহাই আমার বক্তব্য।" আমরা বলি যে, ইহাই আমাদেরও বক্তব্য। ভারতীয় সভ্যতায়, বাঙ্গলার সভ্যতা ফুটিয়া উঠুক। ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির মধ্যেও বাঙ্গলার রূপ ফুটিয়া উঠুক।

বৈশিষ্ট্য মুছিয়া দিয়া যে ঐক্য, তাহা জীবিতের নহে, মৃতের। জীবনের চিহ্নই বিকাশ। বিকাশের পথেই বৈচিত্র্য। কিন্তু বৈচিত্র্য অর্থ বিচ্ছিন্নতা নহে। ক্রমবিকাশের পথে বৈচিত্র্য যত

সুতরাং ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে গিয়া স্যার আশুতোষ প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির বৈশিষ্ট্য রক্ষা, এবং সেই সঙ্গে সমগ্র ভারতে এক ভাবগত ঐক্যের সৃষ্টিকল্পে যে সিদ্ধান্ত সাহিত্যসেবীর নিকট উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা কি ব্যক্তিগত, কি সমাজ-জীবন সম্পর্কে অতি উচ্চ ও বর্ত্তমানে স্বীকৃত যে দার্শনিক সিদ্ধান্ত, তাহার সহিত সম্পূর্ণ অনুস্যূত। কিন্তু স্যার আশুতোষের সিদ্ধান্তের ইহাই শ্রেষ্ঠত্ব, অন্ততঃ একমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব নহে।

বাঙ্গলা দেশে কয়েক বৎসর হইতে "বাঙ্গলার দল" বনাম "বিশ্বের দল" বলিয়া দুইটি আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী যুধ্যমান দলের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতেছে। বাঙ্গলার দল, বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা বিশেষ রূপ ও বিশেষ সুরকে বজায় রাখিয়া ক্রমবিকাশের বিচিত্র পথে অগ্রসর হইতে অভিলাষী। পক্ষান্তরে, বিশ্বের দল, ইউরোপীয় সাহিত্যের ইংরেজী তর্জ্জমা হইতে ভাব ও ভঙ্গী নকল করিয়া, বহু অংশে বাঙ্গলা সাহিত্যের সুচির-কালের ঐতিহাসিক ধারা ও বৈশিষ্ট্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, বাঙ্গলা সাহিত্যকে, তথাকথিত বিশ্ব-সাহিত্যের পদবীতে উত্তীর্ণ করিতে উন্মনা। বলা বাহুল্য, বিশ্বের দলের নিকট ইউরোপীয় সাহিত্যের ইংরেজী তর্জ্জমাই বিশ্ব-সাহিত্য। বিশ্বের দল স্বীকার

না করিলেও, তাঁহারা বাঙ্গলা সাহিত্যের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যকে ইতিমধ্যেই বহু পরিমাণে অস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন; এবং কালে আরও অস্পষ্টতর করিয়া তুলিবার জন্য কথাবার্ত্তায় ইঙ্গিত করিতেছেন। স্যার আশুতোষ এই তথাকথিত বিশ্বের দলকে স্পষ্টই প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কেননা, তাঁহার মতে—"বিজাতীয় ভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্যগঠনের চেষ্টা করা "বাতুলতার কার্য্য।" সুতরাং স্যার আশুতোষ যাহাকে "বাতুলতার কার্য্য" বলিয়া অভিহিত করিতেছেন,—আমরা বাঙ্গলার দল, বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি। তথাপি কেহ কেহ বলেন যে আমরা নাকি উন্মাদ!

আমরা বলিতে কোনরূপ বাধা বোধ করিতেছি না যে, 'বাঙ্গলার দলের' সহিত স্যার আশুতোষের এই মনোজ্ঞ অভিভাষণের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, এবং সেই বাঙ্গলার দলের সমক্ষেও তিনি একটি অপরিহার্য্য সত্যকে অন্ততঃ স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। বাঙ্গলার দল বিভিন্ন জাতির,—তাহা স্বদেশীই হউক, আর বিদেশীই হউক, পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানে কোন দিনই আপত্তি করে নাই, আজিও করিবে না। বাঙ্গলার দল, স্যার আশুতোষেরই সহিত সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন,—"যত সঙ্কোচ, বন্ধন তত কঠোর; যত প্রসার, মুক্তি তত সম্মুখে" এবং পরস্পর * * "আদান প্রদান ছাড়া আমাদের সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয়ের আশা নাই।" কেবল বাঙ্গলার দল আশঙ্কা করেন যে, বাঙ্গলা সাহিত্য 'আদান' করিতে যাইয়া যদি তাহার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে, এবং যাহা সে ইতিমধ্যেই বহু পরিমাণে ফেলিয়াছে, তবে সে 'প্রদান' করিবে

কি ? একটা সাহিত্যের বিচার নির্ভর করে, সে কতটা 'আদান' করিতে পারিয়াছে, তাহার উপরে নয়, পরন্তু সে কতটা 'প্রদান' করিতে পারিয়াছে, তাহারই উপরে। কাজেই আবার বলি, বৈশিষ্ট্য হারাইলে 'প্রদান' করিবে কি ? আর যদি সে প্রদান করিতে না পারে, তবে বিশ্ব-সাহিত্যে তাহার স্থান কোথায় ? কেবলি 'আদান' করিয়া, আর একটা বিজাতীয় সাহিত্যের প্রতিধ্বনি হইয়া কোন্ হতভাগ্য সাহিত্য কতদিন ইতিহাসের বক্ষে তাহার অস্তিত্বের জীর্ণ ভার বহন করিতে পারে ? আর তাহা পারিয়াই বা লাভ কি ? সুতরাং বাঙ্গলার দল, বাঙ্গলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য রক্ষার পক্ষপাতী। সে ইংরাজী তর্জ্জমা হইতে অবিচারে যে 'আদান' ব্যাপার, তাহাকে অত্যন্ত উৎসাহের চক্ষে দেখিতে পারে না। আর কেবল এক ইংলণ্ডীয় বা এমন কি, ইউরোপীয় সাহিত্যকেই বাঙ্গলার দল 'বিশ্ব-সাহিত্য' বলিয়া স্বীকার করিতে অক্ষম কিন্তু বাঙ্গলার দল স্বীকার করেন, এবং মনস্বী স্যার আশুতোষের নিকট যথোচিত কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করেন যে, এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া বিশ্বে আপন অধিকার সাব্যস্ত করিবার যুগে,—প্রতিক্রিয়ার ফলে এবং আত্ম-রক্ষাকল্পে, বিজাতীয় সাহিত্য হইতে যতটা সঙ্কোচনীতি অবলম্বন করিতে বাঙ্গলার দল সতর্ক হইতেছেন, ততটা সঙ্কোচনীতি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে অবলম্বন করিতে কিছুতেই পরামর্শ দেন না। প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির মধ্যে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানে বাধা জন্মাইলে, আমরা নিশ্চিতই নিতান্ত অতর্কিতভাবে একটা সাহিত্যিক আত্মহত্যার পথে পা বাড়াইব। ঠিক এই যুগসন্ধিক্ষণে

প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির মধ্যে তাহাদের নিজ নিজ সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া যাহাতে পরস্পর ভাবের অবাধ বাণিজ্য (Free trade) অনায়াসে চলিতে পারে, তাহার পথ সুগম করিবার জন্য, স্যার আশুতোষ যে আদর্শ প্রকট করিয়া তদুপযোগী কার্য্য-প্রণালীর ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাতে প্রাদেশিক সাহিত্য-গুলিকে, কে জানে, তিনি একটা আসন্ন সঙ্কট হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন কি না? কে জানে, প্রাদেশিক সাহিত্যগুলি তাঁহার উদ্ভাবিত পথে না চলিলে, সমগ্র ভারতে এক অখণ্ড জাতীয়তা-সৃষ্টির বিরোধী হইয়া, অতি নিকটবর্ত্তী ভবিষ্যতে নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া, আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করিবে কি না? কে জানে, একটা আসন্ন বিপদের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে, বাঙ্গলার সারস্বত মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে, একটা সাবধান বাণী, সময় বুঝিয়াই উচ্চারিত হইল কি না? স্যার আশুতোষের সমগ্র অভিভাষণের এই খানেই কৃতিত্ব। বাঙ্গালী, ইংরেজী, এমন কি, ফরাসী সাহিত্যও জানে, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ এবং ফরাসীকেও জানে। কিন্তু বাঙ্গালী, মারাঠী দ্রাবিড় সাহিত্য জানে না, সেই সঙ্গে কে জানে বা বাঙ্গালী, মারাঠী ও মান্দ্রাজ-বাসীকে জানে কি না? বর্ত্তমান ভারতে ইহার মত গুরুতর সমস্যা আর নাই। সমগ্র ভারতব্যাপী যাঁহার দৃষ্টি প্রসারিত রহিয়াছে, আমাদের শ্লাঘার বিষয়, এমন একজন বাঙ্গালী, আজ এই সমস্যার মীমাংসার জন্য অগ্রসর।

প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়া প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির পরস্পর ভাব-বিনিময়ের যে কার্য্যপ্রণালী, স্যার আশুতোষ ইঙ্গিত

করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আমরা তাঁহার আশঙ্কিত "কর্কশ সমালোচনা" প্রয়োগ করিব না,—করিতে পারি না। কেন না, এই কার্য্য-প্রণালীর সমালোচনা এত শীঘ্র হয়ত সম্ভবপর নয়। ফল দেখিয়া কার্য্যপ্রণালীর বিচার বিধেয়। স্যার আশুতোষ উদ্ভাবিত কার্য্যপ্রণালীর ফল এখনও তাঁহারই ভাষায় বলিতে গেলে —"কিছুকাল পরে, বিশ পঁচিশ কি পঞ্চাশ বৎসর পরে দেখা যাইবে।" সুতরাং আমরা এখনই তাহার সমালোচনা কি করিয়া করি?

ইংরেজী ভাষাকে শুধু বিজাতীয় ভাষা বলিয়াই যে স্যার আশুতোষ তাহাকে ভারতের জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিতে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা নহে। যে কারণে ইংরেজী ভাষাকে তিনি প্রত্যাখান করিয়াছেন, ঠিক সেই কারণেই তিনি স্বজাতীয় হিন্দি ভাষাকেও ভারতের একমাত্র সার্ব্বজনীন ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে নির্ভয়ে আপত্তি করিয়াছেন। তিনি বলেন—"যে কারণে ইংরেজী ভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না, সেই কারণেই হিন্দি বা অন্য কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ভাষাও ভারতের একমাত্র সার্ব্বজনীন ভাষা হইতে পারে না। ইংরেজী ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা রূপে গৃহীত হইলে যেমন, প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ ক্রমে তাহার নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া, অশ্বত্থপাদপজাত উপবৃক্ষের মত হইয়া পড়িবে,—সেইরূপ হিন্দিকে সমগ্র ভারতের ভাষা করিতে গেলেও, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ-সমূহ তাহার নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিবে।" স্যার আশুতোষের এই সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

স্যার আশুতোষ বলিয়াছেন,—"আমি সাহিত্যসেবী নহি। বঙ্গসাহিত্যের সেবক বলিয়া স্পর্দ্ধা করিবার আমি অধিকারীও নহি।" কিন্তু এই নব নব উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন অক্লান্তকর্ম্মী, তাঁহার দেহ ও মনের বিপুল শক্তিকে যে ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া নিয়োগ করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই ক্ষেত্র হইতে বাঙ্গলা সাহিত্যের মন্দিরে যে তাঁহার প্রেরিত "রক্ত জবার অর্ঘ্য" আসে নাই, এ কথা সেই বলিবে—যে বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলাকে জানে না। তাঁহার সাহিত্যিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া বাঙ্গলা সাহিত্য বাঙ্গলার রূপকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে আমরা এই আশা করি। বিমাতার গৃহে নিজের মায়ের জন্য যিনি স্থান করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা মায়ের সন্তান, তাঁহারা তাঁহাকে ভুলিবেন না।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ সাল

"ই-ব্রা-হি-ম" ? সাহিত্য

নূতন বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে অধ্যাপক মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়ের একটি গবেষণা এই যে, এই সাহিত্যকে নাকি "ইব্রাহিম" সাহিত্য নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

অধ্যাপক বলিতেছেন,—"এক ব্রাহ্মণ যুবক একবার এইরূপ বিচিত্র পরিচ্ছদে শোভিত হইয়া উৎসবগৃহে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের অশেষ বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। * * সেই ব্রাহ্মণ যুবকটি বলিল, 'মহাশয়গণ, আমার নাম ইব্রাহিম,—আমি না ইংরেজ, না ব্রাহ্মণ, না হিন্দু না মছলমান—অথচ এই চারি জাতির সমন্বয়েই আমি ই-ব্রা-হি-ম।' গল্পে কথিত এই ভদ্র যুবকটির মত, আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গভাষাকে যদি আমি ইব্রাহিম ভাষা বলি, আশা করি তাহা হইলে আপনারা ক্রুদ্ধ হইবেন না।"

অতঃপর যদি প্রশ্ন উঠে,—ততঃ কিম্? অধ্যাপক তদুত্তরে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া সেই 'আধুনিক বিরাট্ প্রশ্নটি'রও 'সমাধান চেষ্টা' করিয়াছেন। অধ্যাপকের বক্তৃতা. যথা—"বায়োস্কোপের ছায়াবাজীর মত, গানের সুরের মত, নদীর বীচিমালার মত, এই জীবন ক্রমাগতই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ইহার যতি নাই, শেষ নাই। জীবনের ধর্ম্মই এই যে, ইহা dynamic বা গতিশীল। জীবনের এই dynamic ভাব, জীবন-মুকুর সাহিত্যেও প্রতিফলিত হইয়াছে। আমাদের সাহিত্য dynamic বলিয়াই আজ তাহা ইব্রাহিম। সুতরাং এ বিষয়ে

আমাদের আক্ষেপের কারণ কি আছে?" কিছু না। তবে একটা আক্ষেপ—যাক্ সে কথা।

বক্ষ্যমাণ অধ্যাপক, সাহিত্যকে একটা "প্রাণময় পদার্থ (living organism) বলিয়াছেন। সাহিত্য একটা জীবন্ত পদার্থ। ইহার জীবন আছে, কাজেই ইহার গতি আছে। আর এ নশ্বর সংসারে যেখানে 'স্ফূটতরদোষাঃ',—সেখানে গতি থাকিলেই উন্নতি ও অবনতির যুগপৎ অবসর আছে। কিন্তু যাহার জীবন আছে, তাহার একটা দেহও আছে, এ কথা নিতান্ত নিরাকারবাদী ভিন্ন সম্ভবতঃ সকলেই রাজা রামমোহনের ভাষায়—"এই অনন্ত প্রকার বস্তু ও ব্যক্তি সংবলিত অচিন্ত্যনীয় রচনাবিশিষ্ট ঘটিকাযন্ত্র অপেক্ষা অতিশয় আশ্চর্য্য—ইত্যাদি" যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, তাহার মধ্যে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সাহিত্যের প্রাণ ও দেহ যদি থাকিল, উন্নতি ও অবনতিমূলক গতি যদি থাকিল, তবে তাহার একটা ব্যক্তিত্বও অবশ্য থাকিবে। প্রত্যেক জীবন্ত সাহিত্যেরই একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাই তাহার ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যের এই ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য একটা অচল 'ফেটীস্' (?) নহে,—যেমন কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন। ইহা একটা সচল দেহ ও প্রাণের জীবন্ত গতির মধ্যেই প্রকট। সাহিত্যের যদি জীবন থাকে, তবে তাহার মৃত্যুও কল্পনা করিতে হইবে। কেন না, ঋষি বলিয়াছেন যে, জীবন ও মৃত্যু একের পর আর আসে যায়। ইহা ব্যঙ্গ নহে—সত্য।

জীবন্ত সহিত্য গতিশীল। আর মৃত সাহিত্য কাজেই গতিহীন।

মাননীয় অধ্যাপকের বক্তব্যে দৃষ্ট হয় যে, তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের 'ইব্রাহিমত্ব'কেই তাঁহার গতিশীলতার লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই যে, বাঙ্গলা সাহিত্য 'ইব্রাহিম' হইলে, তাহার ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য রক্ষা পায় কি না ?

যে কোন সভ্যজাতির সাহিত্যেরই একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যই সেই সাহিত্যের প্রাণ বা আত্মা। সাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্য তাহার গতির পরিপন্থী ত নহেই, পরন্তু কোন সাহিত্যই তাহার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া গতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। কোন বিশেষ সাহিত্য যে মুহূর্ত্তে তাহার বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার গতিও হারাইয়াছে। সাহিত্যের সেই গতি-হীন অবস্থার নামই মৃত্যু। সুতরাং প্রাণময় যে সাহিত্য, তাহাকে সচল ও জীবন্ত রাখিতে হইলে, তাহার ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্যকেও অব্যাহত রাখিতে হইবে।

ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য প্রত্যেক সভ্যজাতির সাহিত্যের যে কেন একটা বিশিষ্ট রূপ দেখা দেয়, সাহিত্যের ইতিহাস, অভিব্যক্তি ও দর্শন আলোচনা করিয়া যাঁহারা খ্যাত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অল্পাধিক সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। অধ্যাপকের আশঙ্কিত "চর্ব্বিত-চর্ব্বণের" যুগে তাহার পুনরুল্লেখ আর না করাই সঙ্গত। বিচিত্র জল-বায়ু, বিচিত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঐতিহাসিক ঘটনা ছাড়াও সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট রূপ-সৃষ্টির আরো গুরুতর কারণ আছে। জগতে প্রত্যেক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জাতির সভ্যতা ও সাধনা একই মানব-সভ্যতার অঙ্গীভূত হইয়াও ঐতিহাসিক বিকাশের পথে বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে।

বিকাশের পথেই বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্যের জন্যই প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতির একটা বিশিষ্ট রূপ, এবং প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতির এই বিশিষ্ট রূপই তাহার সাহিত্যে প্রতিফলিত। যে জাতির সাহিত্য তাহার বৈশিষ্ট্য হারাইতে বসিয়াছে,—নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে, সে জাতিও তাহার বিশিষ্ট 'নামরূপ' পরিত্যাগ করিয়া নিরাকার ও নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা বিশেষ রূপ ও সুরের কথা আমরা বহুবার বলিয়া আসিতেছি। কেন না, ভারতীয় এবং পৃথিবীর জাতিসকলের মধ্যেও বাঙ্গালী জাতির যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে বিশ্বাস করি এবং ভয় না করিয়াই ঘোষণা করি। বাঙ্গলার এই বিশেষ সভ্যতা, বাঙ্গালীর এই বিশেষ সাধনা, তাহার সাহিত্যেরএকটা বিশেষ রূপ ও সুরের মধ্যেই ধরা পড়িয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্য, পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বেও গতিশীল অর্থাৎ অধ্যাপকের কথায় living organismছিল। বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা অতি প্রাচীন গৌরবময় ইতিহাস আছে। আধুনিক ইতিহাসে এম, এ, না জানিলেও আমরা বলিতে কোন দ্বিধা বোধ করিব না যে, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য গতিশীল, এবং অধ্যাপক মোহিনীমোহন শুনিয়া হয় ত আশ্চর্য্য হইবেন যে, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য 'ইব্রাহিম' অন্ততঃ "-ব্রাহিম," না হইয়াও গতিশীল। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য তাহার বৈশিষ্ট্য হারায় নাই, কাজেই তাহার গতিও হারাইয়াছিল না।

নূতন বাঙ্গলা-সাহিত্য "ইব্রাহিম" হইলে তাহার বৈশিষ্ট্য হারাইবে কি না, এই প্রশ্ন উত্থাপনের পূর্ব্বে আর একটি বিষয়ের অবতারণা

করিব, যাহাতে আমাদের বিশ্বাস, ঐ প্রশ্ন উত্থাপনের আর বিশেষ প্রয়োজন হইবে না।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র 'নব-বিধান' করিয়াছিলেন, এই ইব্রাহিম যুগে তাহার মূলে একটা বিশ্বমানবের ধর্ম্মসমন্বয়ের বিরাট্ স্বপ্ন ছিল। তথাপি সমাজ ও ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ পন্থা অবলম্বন করাতে কেশবচন্দ্রের "নব-বিধান" ধর্ম্ম-বিজ্ঞানবিদের নিকট হইতে অতিশয় কঠোর সমালোচনার হস্ত এড়াইতে পারে নাই। যেমন সাহিত্য, তেমনি ধর্ম্মও একটা প্রাণময় পদার্থ; এবং তাহাও একটা বিশেষ জাতির বিশেষ সভ্যতার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকিয়া একটা বিশেষ রূপে ও সুরে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রাণময় পদার্থগুলির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা যায় না। হিন্দু-ধর্ম্মের মস্তক, মুসমান-ধর্ম্মের বক্ষ, খৃষ্টান-ধর্ম্মের হস্তপদ ইত্যাদি লইয়া আর একটা জীবন্ত ধর্ম্ম সৃষ্টি করা চলে না। ব্রহ্মানন্দের কল্পনা বিশ্বব্যাপী উদার, তাঁহার কার্য্যপ্রণালী বিজ্ঞান-বিরোধী, জীবনের নিয়ম-বিরোধী, হাস্যকর ও উদ্ভট। জড়পদার্থ সৃষ্টি করিতে যে উপায় কার্য্যকারী হইতেও বা পারে, প্রাণময় পদার্থের সৃষ্টিতে সে উপায় অবলম্বন করিলে চলিবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলায় তাহা চলে নাই।

ঠিক এই ভ্রান্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলা সাহিত্যের 'সৃষ্টি', যদি ইহা অধ্যাপকের মতে একান্তই সৃষ্টির যুগ না হয়, তবে এমন কি, 'সমালোচনা'ও চলিবে না। সাহিত্য প্রাণময় পদার্থ। বিভিন্ন প্রাণময় পদার্থের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করিয়া সেলাই করিলে অতি বড় খলিফা ব্যক্তিও আর একটা প্রাণময় বস্তু বা সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। কেন না, প্রাণময়

পদার্থের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রাণহীন। আর প্রাণহীন কতকগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমবায়ে সৃষ্ট যে বস্তু, তাহাও কাজেই প্রাণহীন। কাজেই 'ইব্রাহিম'-সাহিত্য প্রাণময় জীবন্ত সাহিত্য হইবে না। তাহা 'ইব্রাহিম'-নামধেয় জড়পদার্থ হইবে। অধ্যাপক যাহাই বলুন, বাঙ্গলা সাহিত্যকে আমরা জড়পদার্থ করিতে প্রস্তুত নহি। 'ইব্রাহিম'-জামা কোন দরজি হয় ত সেলাই করিয়া দিতে পারেন। অবশ্য, আমরা তাহারও পক্ষপাতী নহি। কিন্তু স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্টিতেও "ইব্রাহিম"-সাহিত্য সৃষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং যাহা অসম্ভব ও উদ্ভট, তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাইবে, কি পাইবে না, তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ সাল

বিশ্ব (?)—সমালোচনা

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঙ্গলা সাহিত্যে আমরা বাঙ্গলার রূপ দেখিতে চাই। কিন্তু "বাঙ্গালী সাহিত্যে'র আলোচনা প্রসঙ্গে অন্ততঃ এক সম্প্রদায় বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, বাঙ্গলার পক্ষে বিশ্ব হইতেছে 'বিলাত', কাজেই বাঙ্গলা সাহিত্যের নিকট বিশ্ব-সাহিত্য হইতেছে বিলাতী সাহিত্য। আর বাঙ্গলা সাহিত্যের বিলাতী রূপই বাঙ্গলার রূপ।

সুতরাং বিলাতী সমালোচনাকেও আমরা কেননা বিশ্ব-সমালোচনা, বলিতে পারিব? সম্প্রতি এইরূপ একটী বিলাতী ওরফে বিশ্ব-সমালোচনায় নব্য উপন্যাসলেখক শরৎচন্দ্র ও স্যার রবীন্দ্রনাথ কিরূপে সমালোচিত হইয়াছেন, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস আমরা দিব।

১৯১৮, ১১ই জুলাইয়ের London Times"এ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সেই প্রসঙ্গে স্যার রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সম্বন্ধে একটু সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। কেন যে বাহির হইয়াছিল, তাহা আমরা জানি না। অগ্রহায়ণের 'ভারতবর্ষে সেই বিলাতী সমালোচনা বিলাতী হরফেই বাহির হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে 'সবুজপত্রে' স্যার রবীন্দ্রনাথের এক অতি প্রশংসামূলক বিশ্ব-সমালোচনাও, বিশ্ব-হরফেই মুদ্রিত হইয়াছিল। 'সবুজপত্রের' সুযোগ্য সম্পাদক বিশ্ব-হরফকে বাঙ্গলায় অনুবাদ

করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই, এবং না করার এই কারণ দিয়াছিলেন যে, সবুজপত্রের পাঠক এবং পাঠিকারাও বাঙ্গলা হরফ অপেক্ষা বিশ্ব-হরফের সহিতই অধিক সুপরিচিত।

এখন London Times এর বিশ্ব-সমালোচনায় সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখক শরৎ বাবুর উপন্যাস সম্বন্ধে কি অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত সার নিয়ে দিতেছি। Times এর বিশ্ব-সমালোচনা বলেন—

—শরৎ বাবু মোঁপাসার সমকক্ষ ও তুল্য লেখক।

—মিথুন রাগের সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে ফরাসী লেখকদের মত শরৎ বাবুর মধ্যে একটা অসুস্থ উত্তেজনা নাই।

—স্ত্রীলোক ও ছেলেদের চরিত্রাঙ্কনে তিনি যে কোন দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সহিত তুলনীয়।

—বাঙ্গলা দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণীর মেয়েদের চরিত্রাঙ্কনে ও তাহাদের হাব-ভাব, কথাবার্ত্তা সাহিত্যে হুবহু ফুটাইয়া তুলিতে, তাঁহার মত লেখক ভারতে নাই।

—বঙ্গ-মহিলাগণ পর্দ্দানশীন বলিয়া, বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের একটা বড় অংশ পর্দ্দার অন্তরালে লুক্কায়িত। পর্দ্দার অন্তরালের এই বৃহৎ সামাজিক জীবন, শরৎ বাবুর লেখায় সুপরিস্ফুট।

—শরৎ বাবু একজন প্রকৃত শিল্পী। কাজেই সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি মুখ্যতঃ তাঁহার শিল্প-সৃষ্টিতে স্থান পায় নাই।

—সুস্থ রক্ষণশীলতার প্রতি তাঁহার মনের একটা ঝোঁক আছে।

—বাঙ্গলার প্রাচীন ধর্ম্ম ও রীতি-নীতির যে পাশ্চাত্য ও আধুনিক ব্যাখ্যা দেখা দিয়াছে, তিনি তাঁহার পক্ষপাতী নহেন।

—তিনি অতীত কাল ও প্রাচীন রীতির অনেকটা পক্ষপাতী।

—বাঙ্গালী-সমাজের মানসিক অবস্থার একটা পরিচয় তাঁহার লেখা হইতে পাওয়া যায়।

—বাঙ্গালী-সমাজের ভাল অংশের সহিত তাঁহার সহানুভূতি আছে।

—তিনি সাহসী। কেননা, রাজনৈতিক উন্নতি দ্বারা সামাজিক সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে, ইহা তিনি মনে করেন না।

—রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা নহে, পরন্তু বুদ্ধিমত্তার অনুশীলন দ্বারাই ভারতবাসিগণ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যে তাহাদের দায়ীত্ব ও অধিকার বুঝিয়া পাইবে।

আমরা এই শেষ মন্তব্যটির উত্তরে শুধু বলিব,—আমেন্! যদি ইহার কোন উত্তর দিবার প্রয়োজন থাকে, তবে সে উত্তর দিবার জন্য দায়ী হয় শরৎ বাবু স্বয়ং, অথবা তাঁহার হইয়া যাঁহারা এইরূপ 'বিশ্ব-সমালোচনা' যাচ্‌ঞা করিয়া আনেন, তাঁহারা। Times-'বিশ্ব' দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের সমালোচনাকে অদ্যাপিও রামপ্রসাদের কথায়, আমরা "দেঁতোর হাসি" বলিয়াই উপেক্ষা করিবার স্পর্দ্ধা রাখি। আমাদের ভাষা-জননী যেন সন্তানের এই স্পর্দ্ধাকে অক্ষুণ্ণ রাখেন।

সে যাহাই হউক, স্যার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই Times 'বিশ্ব' যাহা বলিয়াছেন, তাহারও সংক্ষিপ্ত সার উদ্ধার করিতেছি। Times 'বিশ্ব' বলেন যে,—

—রবীন্দ্রনাথকে বাঙ্গলার প্রতিদ্বন্দ্বিহীন, এক অদ্বিতীয় লেখক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না।

—মোঁপাসার সমকক্ষ আসন রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া যায় না। কেননা, মোঁপাসার পর্য্যবেক্ষণশক্তি, জগতের পরিণামচিন্তায় একটা নিরাশার ভাব, এবং হাস্যরস অবতারণার আশ্চর্য্য ক্ষমতা, রবীন্দ্রনাথের নাই।

—রবীন্দ্রনাথ একজন কবি। প্রেমিকার মনোভাব, ইন্দ্রিয়-লিপ্সা ও তাহার জন্য একটা আবেগ ও উন্মাদনা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে।

—রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে কোন সৌন্দর্য্যই নাই। মূলেও নাই, অনুবাদেও নাই।

—রবীন্দ্রনাথকে বাঙ্গলার এক অদ্বিতীয় লেখক বলিয়া ধরিলে সাহিত্যের ক্রমোন্নতির ধারাকেই ভুল করিয়া বুঝা হইবে।

—Black wood Magagineএ গীতাঞ্জলির কবিকে অযথারূপে প্রশংসা করা হইয়াছে। গীতাঞ্জলির কবি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের নিকট কত ঋণী, এবং তাঁহার সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যেই বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহার স্থান কোথায়, ইহা যথাযথরূপে নিরূপণ করা হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের অযথা প্রশংসামূলক বিলাতী ওরফে '*বিশ্ব-সমালোচনা*'য় যে সকল রাবিন্দ্রিক সাহিত্যিকগণ স্ফীতবক্ষ হইয়া 'ঘোরো' (?) সমালোচনাকে নিতান্তই অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা চক্ষু কচলাইয়া আজ সহসা দেখুন যে,

বিলাতী সমালোচনা যেমন অযথা প্রশংসামূলক হইতে পারে, তেমনি অযথা নিন্দামূলকও হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের প্রশংসামূলক যে সমস্ত বিলাতী সমালোচনাকে রবীন্দ্রশিষ্যগণ বিশ্ব-সমালোচনা বলিয়া ফুল-চন্দনে পূজা করিতেছিলেন, আজ সেই বিলাতী সমালোচনাকেই—যাহা বলে, 'রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে কোনই সৌন্দর্য্য নাই'—কিরূপে সমাদর করিবেন, তাহাই দেখিতে অভিলাষী হইয়াছি।

বাঙ্গলা সাহিত্য যতই 'ঘোরো' হউক, Times বিশ্ব তাহার সমালোচনার কষ্টি-পাথর নহে। আর যদি তাই হয়, তবে এই বর্ব্বর-সুলভ নির্লজ্জতা লইয়া সাহিত্যসৃষ্টির কথা মুখে আন কোন্ সাহসে? বাঙ্গালীকেই বাঙ্গলা সাহিত্য প্রথমে সমালোচনা করিতে হইবে। আর সে সমালোচনার কষ্টীপাথর হইতেছে বাঙ্গলার রূপের নব নব রূপান্তর। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ও শরৎ বাবুর উপন্যাসগুলির বিস্তৃত সমালোচনার এ অবকাশ নয়। তথাপি এই নিতান্ত অনবকাশের মধ্যেও এ কথা বলিতে আমরা বাধ্য হইতেছি যে, London Times এর সমালোচনার মূল্য অতি অল্প। এবং তাহার কারণ London Times বাঙ্গালী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য জানে না।

আমরা ইংরেজী সাহিত্য যতটা যেরূপে আয়ত্ত করিয়া সবুজপত্র সম্পাদকের কথায়, অন্ততঃ ওকালতী আর এডিটারী করি, Times এর সমালোচক কি বাঙ্গলা সাহিত্যের ধারাকে সেইরূপ আয়ত্ত করিয়া রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-সমালোচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন?

রবীন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ ছোট গল্প Times বিশ্ব পড়িয়াছেন, তাহা বলেন নাই। শরৎ বাবুর স্ত্রী-চরিত্র অঙ্কনে বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু বৈচিত্র্য নাই। বৈচিত্র্যহীন একই বিশেষ স্ত্রী-চরিত্র অল্পাধিক প্রায় সকল গল্পেই আসিয়া উপস্থিত হয়। তা সত্ত্বেও 'বিন্দুর ছেলে' আর 'মেজ দিদি'র কয়টি গল্প পড়িয়া শরৎ বাবুর উপন্যাসের উপর যেরূপ মাতব্বরী সমালোচনা Times বিশ্ব অকুতোভয়ে চালাইলেন, তাহা প্রকৃতই Times এর পক্ষে ধৃষ্টতা-জ্ঞাপক। Times সমালোচকের এই ধৃষ্টতাকে কে প্রশ্রয় দিল? শরৎবাবু, আশা করি, বিস্মৃত হইবেন না যে, আজ যাহা বিদেশীর অযথা প্রশংসা, আবার কালই তাহা তাঁহার অযথা নিন্দায় পর্য্যবসিত হইতে পারে। আর সাধারণতঃ হইয়াও থাকে তাহাই। দৃষ্টান্ত? রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে যে সঙ্গতিরক্ষা আছে, যে নিপুণ চরিত্রাঙ্কন, যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ, যে শিল্পকলার ও রসসৃষ্টির চরম উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায় তাহা London Times এর বিশ্ব-সমালোচকের দৃষ্টিতে একেবারেই সৌন্দর্য্যহীন মলিন বলিয়া উপেক্ষিত হইল। রবীন্দ্র শিষ্যগণ এক্ষেত্রে কি বলিবেন? London Times এর সমালোচক জ্ঞাত না থাকিলেও শরৎ বাবু নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে,—তাঁহার শিল্পসৃষ্টিতে বৈচিত্র্য কত কম, রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ কত বেশী, এবং প্রাচীন রীতি-নীতির পক্ষপাতিতার বালাই তাঁহার একেবারেই নাই। বরং শরৎ বাবুর সাহিত্যসৃষ্টিতে যে একটা বিদ্রোহের সুর ফুটিয়াছে, এবং তাঁহার বলিবার যে নিজের একটা ভঙ্গী আছে, তাহাই এক শ্রেণীর

তরুণ উপন্যাস পাঠকদের নিকট একটা মাদকতার সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু মাদকতায় শক্তি নাই। আছে শক্তির ক্ষয় ও অপচয়।

London Timesএর এই সমালোচনা আর যাহাই করুক না কেন, শরৎ বাবুকে, রবীন্দ্রনাথের নিকট একটু লজ্জিত না করিয়া ছাড়ে নাই। রবীন্দ্রনাথ হয় ত একটু হাসিয়াছেন।—অনুকরণ কি এমনি করিয়াই করিতে হয়?

শ্রাবণ, ১৩২৬

"বাঙ্গলার প্রাণ" ও আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য

আমরা বার বার এই কথাই বলিতেছি যে, 'বাঙ্গলার প্রাণ' আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাঙ্গলার চিরন্তন রূপের একটা স্বাভাবিক বিকাশ আধুনিক সাহিত্যে নাই।

"বাঙ্গলার গীতা-কবিতা"র আলোচনায় কবি চিত্তরঞ্জন দেখাইয়াছেন যে,—

—বাঙ্গলার প্রাণের একটা স্বরূপ আছে।

—প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

—আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে তাহা ফুটে নাই।

—এবং আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের ধারাকে বাঙ্গলার প্রাণের ধারার সহিত মিশাইয়া দিতে না পারিলে ইহা বাঙ্গালীর স্থায়ী-সাহিত্যরূপে পরিগণিত হইতে পারিবে না।

আমাদের এই সমালোচনার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বাঙ্গলা মাসিক পত্রে নানা শ্রেণীর সমালোচনা দেখা দিয়াছে। ইহাতে আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইতেছে।

পৌষের 'প্রবাসী'তে 'বঙ্গের পাঁচালি-সাহিত্যে'র লেখক বলিতেছেন যে, "আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে সুন্দর উচ্চ ভাব-নিচয়ের সমাবেশ রহিয়াছে, পরিপাটী রচনা ও কলা-কৌশল আছে, সুবিন্যস্ত মনোহর বাক্য-বিন্যাস আছে", তথাপি এই

"আধুনিক সাহিত্য কৃত্রিম।" "এ সাহিত্য যেন বিদেশীয় সাহিত্য, ইহা যেন বাঙ্গালীর সাহিত্য নয়।"

অগ্রহায়ণের "পরিচারিকা"তে "স্বদেশী সাহিত্যে"র লেখক বলিতেছেন যে, "সাহিত্যে যাঁহারা 'সংরক্ষণনীতি' অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা কোন দিনই বৈদেশিক সাহিত্যের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে বলেন না কিংবা তাঁহারা সাহিত্যের একটা গত যুগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী নহেন, তাঁহাদের কথাটা কিছু অন্য প্রকারের। তাঁহারা ইহাই বিশেষ করিয়া বলিতে চান যে, বৈদেশিক প্রভাব থাকে থাকুক, আপত্তি নাই, কিন্তু ভারতবর্ষের বিশেষত্ব [যাহা, আমরা বলি ভারতবর্ষের মধ্যে আবার বাঙ্গলার বিশেষত্ব যাহা,] তাহা যেন বৈদেশিক প্রভাবে চাপা পড়িয়া না যায়।"

ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ। এই মহাদেশের অন্তর্গত বাঙ্গলা দেশেরও এক অতি পরম আশ্চর্য্য বিশেষ সভ্যতা আছে। বাঙ্গলা সাহিত্য বাঙ্গালীর সেই বিশেষ সভ্যতারই অঙ্গীভূত। আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যে বাঙ্গালীর প্রাণেরই নিত্য নূতন বিকাশ দেখিতে চাই। বাঙ্গলার রূপের নিত্য নূতন রূপ বা রূপান্তর দেখিতে চাই।

অগ্রহায়ণের "সাহিত্য," কার্ত্তিকের "প্রবাসী"তে শ্রদ্ধেয় ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধের যথোচিত তীব্র সমালোচনা করিয়া যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সাহিত্য-সেবি-মাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। "সাহিত্য"-সম্পাদক সমালোচনা-সাহিত্যে নির্ভীক এবং স্পষ্টবাদী। তিনি নরেশবাবুর প্রবন্ধ

অতি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নরেশবাবুর মতে "বিশ্ব"-সাহিত্য হইতেছে "বিলাতী সাহিত্য"। ইহাঁরা 'বিলাতী' শিক্ষালাভ করিয়া মনে করেন যে, 'বিশ্ব' শিক্ষালাভ করিলেন, এবং এই শিক্ষার গুণে "নাগাদ বিলাতী জুতা ও ইস্তক বিলাতী কুকুর" ইহাঁরা পরম আদরে সহ্য করেন।

"সাহিত্য"-সম্পাদক বলেন,—

—"বিলাতী শিক্ষা ও বিলাতী সাহিত্য বাঙ্গলা অক্ষরের পোষাক পরিয়া স্বদেশী হইতে পারে না, পারিবে না।"

—"জাতীয় প্রকৃতির, জাতীয় সংস্কারের ও জাতীয় ভাবের বিরোধী, বিদেশের আমদানী 'বিশেষত্ব' কোনও সাহিত্যেরই সৃষ্টি করিতে পারে না।"

—"জাতীয় সাহিত্যের সম্পূর্ণ বিকাশও স্বাভাবিক হইলে তাহাতে মানব-জাতির আরাধ্য ভাব-সম্পদের উদ্ভব হইতে পারে, তাহাতে 'বিশ্ব'-সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে। * * * বাঙ্গালীর প্রাণ হইতে যদি বিশ্বের বরেণ্য ভাব-সম্পদের উদ্ভব হয়, তাহা বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে নিশ্চয়ই আপনার স্থান অধিকার করিবে।"

আমাদের কথা ঠিক ইহাই। জাতীয় সাহিত্যেরই পূর্ণ অভিব্যক্তিতে, যাহাকে আমরা বলি কাব্যের 'রূপান্তর', বিশ্ব-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়; পরন্তু বিলাত বা বাহির হইতে ধার করিয়া ভাব আনিলে যে বিশ্ব-সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না, এই কথাই আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি।

আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে বাঙ্গলার প্রাণকে আমরা খুঁজিয়া

পাই না বলাতে অনেকে মনে করিয়াছেন যে, আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্যকে অযথা আক্রমণ করিতেছি। তাঁহারা যদি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া আমাদের কথাগুলি আরও একটু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন, তবে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন যে, কোন বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্যকে বিশেষভাবে আক্রমণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়,—বাঙ্গলার প্রাণের ধারার সহিত বাঙ্গালীর সাহিত্যের সম্বন্ধ নির্ণয় করাই আমাদের উদ্দেশ্য, এবং এখন পর্য্যন্তও আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না যে, আমাদের উদ্দেশ্য খুব মন্দ। আর অনেক সাহিত্যামোদী হয় ত অবগত নহেন যে এবিষয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতের সহিত আমাদের অতি আশ্চর্য্য রকমের মিল রহিয়া গিয়াছে। কেন না, রবীন্দ্রনাথ বহু স্থানে বহু রকমের কথা বলিলেও এক স্থানে সত্যই তিনি লিখিয়াছেন—"—আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাংলা দেশের বা বাঙালীর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না—আজকাল কেবল ম্যাপেই বাংলা দেশ আছে। যদি কখনও বাংলা দেশের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়, তাহা হইলে তখন বাংলা সাহিত্য পড়িয়া এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বাংলা এমন একটা দেশের সাহিত্য, যে দেশ কোনও কালে বর্ত্তমান ছিল না।"

আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য পড়িয়া আমরা ত সেই প্রশ্নই করিতেছি যে, ইহা কাহাদের? যে বাঙ্গালী, সেই এ প্রশ্ন করিবে। আর যে বাঙ্গালী নয়, তাহার সহিত আমাদের প্রয়োজন কি?

মাঘ, ১৩২৫ সাল।